কিশোর বিস্ময়

কে-কি-কেন-কবে-কোথায় ? এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর সব সময় খুঁজে বেড়ায় পৃথিবীর প্রাণীজগতের লক্ষ লক্ষ সদস্যের মাত্র একজন। তার নাম মানুষ। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে বলেই মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী। কিন্তু মানুষের শৈশবে কি থাকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পালা ? হয়তো না। তখন বয়স্ক কারো কাছ থেকে উত্তরটুকু জেনে নিয়েই খুশি। সে-উত্তর সঠিক কিনা, কিংবা কেন সঠিক তা আর যাচাই করতে পারে না সে। শিশু ক্রমে হয় বালক, তারপর কিশোর। বালক যখন কিশোর হয় তখন সে আর চুপ করে সব মেনে নিতে পারে না। শুরু হয় জানার পালা যাচাই করার পালা। যতোই সে জানাতে থাকে ততোই বিস্মিত হয়। এইভাবে অবাক হওয়া চলতে থাকে শেষ দিন পর্যন্ত। কারণ জানা কখনও শেষ হয় না। সেই কারণেই কিশোর বয়সের সঙ্গে বিস্ময় গায়ে গায়ে জড়িয়ে। যাকে বলা যায় কিশোর-বিস্ময়। কিশোরদের বিস্ময় উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই নতুন মাসিক পত্রিকা 'কিশোর-বিস্ময়'-এর আত্মপ্রকাশ। কিশোরদের জানা ও যাচাই করার আনন্দ উৎসবে 'কিশোর বিস্ময়' হাতে হাত মেলাবে ছোট্ট বন্ধুদের সঙ্গে। তারা এক সঙ্গে পথ চলবে শুধু এই সংখ্যায় নয়, প্রতি সংখ্যায়।

অনীশ দেব
সম্পাদক

কিশোর বিস্ময়

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা | ছোটদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্ময়কর পত্রিকা | মে : ১৯৮৪

ধারাবাহিক উপন্যাস

১৭ সময় পর্যটক টারজান
● অদ্রীশ বর্ধন
অতীত কালের বিভিন্ন সময়ে রাখা চারটে চাবি উদ্ধার করলে বাঁচবে ২২৬০ সালের মানুষ। সময় পর্যটক টারজানের রোমাঞ্চকর চাবি উদ্ধার কাহিনী……

বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প

৬ ঘটোৎকচের জাগরণ
● সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
মানুষের অপ্রাকৃত রূপান্তর নিয়ে অসাধারণ চাঞ্চল্যকর কাহিনী

২১ ভূতো কুঠি
● দীপংকর লাহিড়ী
বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক ভূতের বাড়ি… সেই অপার্থিব শব্দ নিয়েই এই গল্পের শিরশিরানী…

মজাদার কল্পকাহিনী

৪৫ গ্রহ চারশো বিশ
● হারুণ অর রসিদ
একটি আজব গ্রহকে নিয়ে অদ্ভুত মজার কল্পকাহিনী…

বিজ্ঞান ছড়া

৫ মহাকাশে সময়
● রঞ্জন ভাদুড়ী

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান

৫৩ হিপোক্রেটিস
● দেবব্রত রায়চৌধুরী

বিজ্ঞানের ভেলকি

৬০ ম্যাজিক জানালা
● মার্টিন গার্ডনার
অবলম্বনে অশোক রায়

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা

৪২ বিচিত্র চিঠি
● গীতা গঙ্গোপাধ্যায়

৪৪ দুর্ঘটনায় আবিষ্কার
● অশোক রায়

নিয়মিত বিভাগ

৫৩ ধাঁধা :
● অজয় ঘোষ

৫৮ শব্দছক
● সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

৪ বিজ্ঞান সংবাদ
● সত্যসাচী সেনশর্মা

বিশেষ ক্রোড়পত্র : বিদ্যুৎ

২৪ তড়িৎ বিজ্ঞান ও ফ্যারাডে
● অরিজিৎ বসু রায়
তড়িৎ বিজ্ঞানের উন্নতির সোপান ও তড়িৎ বিজ্ঞানের জনক মাইকেল ফ্যারাডেকে নিয়ে মনোগ্রাহী রচনা…

৩১ দূতের ভূমিকায় বিদ্যুৎ
● ডঃ অজয় চক্রবর্তী
সংবাদ আদান প্রদানে বিদ্যুতের দান এবং টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের চাঞ্চল্যকর কাহিনী…

৩৫ সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ
● বৈদ্যনাথ রায়
সৌর শক্তিকে কি কি উপায়ে বিদ্যুত শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাই নিয়ে রচনা…

৩৮ ক্রোড়পত্র কুইজ
এ সংখ্যার বিশেষ কুইজ বিদ্যুৎ নিয়ে। তড়িৎ সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসার অনেক উত্তর!

সম্পাদক : অনীশ দেব

নির্বাহী সম্পাদক : অশোক রায়

নামাঙ্কণ : বিমল দাস ● অলঙ্করণ : শ্রীবিদ্যা অশোক ● সার্কুলেশন : নীহার রায়

অশোক কুমার রায় কর্তৃক কিশোর বিস্ময়ের পক্ষে ১১৭ কেশব সেন স্ট্রীট, কলি-৯ হইতে প্রকাশিত। ও তৎকর্তৃক অনুরাধা প্রেস, ১১৭.কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

সুব্রত সেনশর্মা

প্ল্যাস্টিকের গাড়ি :

খুব শীঘ্রই অটোমোবাইল ইন্ডাষ্ট্রি ধাতুর ব্যবহার ভুলে যাবে। ডেট্রয়েটের একটি গাড়ী তৈরী সংস্থা ধাতুর বদলে এক রকম শক্ত সুদৃঢ় কাঁচ মিশ্রিত পলিয়েস্টার আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা মোটর গাড়ীর পার্টস তৈরী করা চলবে। যেমন ইতিমধ্যেই তারা তৈরী করে ফেলেছেন গাড়ীর ষ্টিয়ারিং, হাতল, বাম্পার পার্টস, তৈলপাত্র, ওয়াইপার জ্বালানীর লাইন, ক্লিপ ইত্যাদি। অন্যান্য রেজিনের থেকে এর দৃঢ়তা ৪০ শতাংশ বেশী। এর হিট ডিফ্লেকসান উষ্ণতা ১০ শতাংশ বেশী ইদানীং ব্যবহৃত সামগ্রীর চেয়ে। ১৮৫ ডিগ্রী ফারেনহিট হচ্ছে এর গলনাঙ্ক। সুতরাং এত সুবিধার জন্য আমরা হয়ত কিছু দিনের মধ্যেই প্ল্যাস্টিকের গাড়ী দেখতে পাব রাস্তায়।

কচ্ছপের নকল ডানা :

আমেরিকার ফ্লোরিডা সমুদ্র তীর থেকে জেলেরা হাঙরের মুখ হতে একটা কচ্ছপকে উদ্ধার করে। আহত কচ্ছপটির দুটি ডানা খোয়া গেছে হাঙরের আঘাতে। একটা ডানা কনুইয়ের কাছ থেকেও অন্য ডানাটা কাঁধের কাছ থেকে অ্যাম্পুট করা হয়েছে। অস্থি বিশারদ সার্জন প্যাট্রিক বারি ও পশ্চিম জার্মানীর জারগেন টফ্‌ড অস্ত্রোপচার করে বেচারী কচ্ছপের দু'টি রাবারের পাখনা জুড়ে দিয়েছেন। ধাতুর জয়েন্ট দেওয়া এই রবারের পাখনা তৈরী করেছেন ওহিহোর এক টায়ার সংস্থা। কচ্ছপটি দিব্যি জলে সাঁতার কাটতে পারছে বলে ডাক্তাররা আশা করছেন। ডাক্তাররা কচ্ছপটির নামকরণ করেছেন লাকি। যদি সব বাধা ঠিক মত কাটিয়ে ওঠা যায় তাহলে শীঘ্রই লাকিকে তার বাড়ি অর্থ্যাৎ সমুদ্রে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বিড়ালের আঁচড়ে প্লেগ :

সনাতন নিয়ম : বিড়াল প্লেগ রোগের স্রষ্টা ইঁদুর মারে। কিন্তু সম্প্রতি অ্যামেরিকান মেডিক্যাল এশোসিয়েশনের পত্রিকায় জানিয়েছে প্লেগ রোগ বিড়ালও ছড়াতে পারে। কামড়ালে বা আঁচড়ালেও রোগ হতে পারে। কয়েকজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেছেন দশ বছরের এক বালিকা প্লেগে আক্রান্ত হয়েছে একটি সবল স্বাস্থ্যবান বিড়ালের আঁচড়ে। অন্য একটি ঘটনায় দেখা গেছে, এক মহিলার প্লেগ হয়েছে তার পোষা বিড়ালকে আদর করতে গিয়ে। ঐ বিড়ালটি তখন একটি মুষিক ভক্ষণ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। প্রথনে চিকিৎসায় কিছু ধরা পড়েনি। প্রথমে ধারণা করা গিয়েছিল প্রস্রাবে গন্ডগোল হয়েছে তারপর নিমোনিয়া। অবশেষে যখন রোগ ধরা পড়ল তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মহিলা কিছুদিনের মধ্যেই মায়া যান। অটোপসিতে প্লেগ ধরা পড়েছিল। বিড়ালটাও কিছুদিন পর মারা যায়। অটোপসিতে আরো দেখা যায়, বিড়ালের মৃত্যুর কারণও ঐ প্লেগ রোগ। সেও ঐ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

জোয়ার থেকে গুড়

এখন থেকে জোয়ারের কান্ড থেকে গুড় তৈরী করা যাবে। মহারাষ্ট্রের সাতরা জেলার ফালতনে নিম্বকর অ্যাগ্রিকালচার রিসার্চ সেন্টার একটি অভিনব পদ্ধতিতে ২৫ কুইন্টাল গুড় তৈরী করেছেন এক হেক্টর জমিতে ২৫ কুইন্টাল জোয়ার চাষ করে। ঐ সংস্থার ডাইরেকটর শ্রীযুক্ত নিম্বকর জোয়ারের গুড়ের স্যাম্পেল মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বসন্তরাও পাতিল ও তাপ ও জ্বালানী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবশংকরের হাতে তুলে দিয়েছেন।

মহাকাশে সময়

রঞ্জন ভাদুড়ী

ধরো তুমি মহাকাশ যাত্রী,
মহাকাশ যানে চেপে পৃথিবী-প্রদক্ষিণে যাচ্ছ—
শুনেই হয়তো মজা পাচ্ছ—
যাত্রা করেছ শুরু সোমবার সকালে
ঠিক সাড়ে-আটটায়,
তোমার আকাশযান ছাড়িয়ে মাটির মহাকর্ষ
ছাড়িয়েছে এ-ভারতবর্ষ,
উপগ্রহের মতো পৃথিবী-প্রদক্ষিণে হয়েছে সে মত্ত,
যখন পৌঁছে গেছ অন্য গোলার্ধে
আমেরিকা-মহাদেশ-আকাশে
সেখানে উঠেছে চাঁদ—সুগোল বা বাঁকা সে,
চারিদিকে তারা জ্বলে ঝিকমিক—
তখনও কি সোমবার ? উত্তর দিতে হবে ঠিক-ঠিক।
সোমবার রাত্রি ?
ভুল হল, মহাশয় মহাকাশ যাত্রী !
রাতটা আগের রাত—অর্থাৎ রবিবার রাত্রি।

কী করে তা সম্ভব ? বলছি,
আমি য়ুরি গাগারিন বলছি,
ধরে নাও, আমিও তোমার সাথে চলছি—
সতেরো শো ষাট কিমি বেগে প্রতি ঘণ্টায়
আহ্নিক গতি নিয়ে পৃথিবীটা ঘুরছে,
তারো চেয়ে ষোলো গুণ বেশি বেগে
আমাদের মহাকাশযানখানা উড়ছে—
সোমের সকালে শুরু যাত্রা
তাই তো ছাড়িয়ে যাবে সময়ের মাত্রা—
আমরা এগিয়ে গেলে ধরা দেবে রবিবার রাত্রি,
অতীতকে ফিরে পাব মহাকাশে মহাকাশযাত্রী।

বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প

ঘটোৎকচের জাগরণ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সেহরাগড় ফরেস্টবাংলোয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নাম ডক্টর আর পি গুপ্টা। তিনি এক বিস্ময়কর মানুষ!

প্রথমে চোখে পড়েছিল ওঁর অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য! অত লম্বা মানুষ গিনেস রেকর্ড বইতে এখনও উল্লিখিত হননি বলে আমার বৃদ্ধ বন্ধু আক্ষেপ করেছিলেন। তাই শুনে ডাঃ গুপ্টা হাসতে হাসতে বললেন, 'কী দরকার? আসলে কী জানেন, নিজের এই লম্বা হওয়া নিয়ে আমার নিজেরই ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। রাস্তাঘাটে বেরুলে সাড়া পড়ে যায়। যেখানে যাই, পেছনে ভিড়। তার ওপর সমস্যা হল, দরজার মাপ। কোনো বাড়িতে ঢুকতে হলে প্রতিমুহূর্তে আমাকে নিজের উচ্চতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় মনেও থাকেনা কথাটা এবং মাথায় ঠোক্কর খাই। এই দেখুন না, কী অবস্থা হয়েছে।'

কপালে অনেক কালো ছোপ দেখে সমস্যাটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। বললাম, 'আপনার এই দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থটাও যদি বাড়ত, তাহলে লোকেরা আমাকে ভয়ও পেত।'

ডঃ গুপ্টা বললেন, 'রক্ষে করুণ মশাই। তাহলে লোকেরা আপনাকে ঘটোৎকচ বলতে শুরু করত। কী বলেন কর্নেল?'

কর্নেল চোখ বুজে শাদা দাড়ি টানাটানি করছিলেন। বললেন, 'আচ্ছা ডঃ গুপ্টা, কবে থেকে আপনি লম্বা হতে শুরু করেছেন?'

ডঃ গুপ্টা কর্নেলের কথায় অবাক হলেন যেন। 'তা তো লক্ষ্য করিনি। তবে যতদূর মনে পড়ছে, মাস তিনেক আগে একদিন ভোরবেলা বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে চৌকাঠে ঠোক্কর লাগল মাথায়। তখন···মাই গুডনেস!'

উনি আরামকেদারা থেকে সোজা হলেন হঠাৎ। কর্নেল বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'আমার মতো বোকা দেখছি পৃথিবীতে নেই।' ডঃ গুপ্টা মুখে হতাশার ভাব ফুটিয়ে বললেন। 'কী আশ্চর্য্য! সত্যি তো ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত ছিল

আমার। ওই প্রথম মাথায় ঠোক্কর খাবার আগের দিন সম্ভবত আমার উচ্চতা প্রায় স্বাভাবিক ছিল।.....হ্যাঁ, স্বাভাবিক ছিল। কারণ তার আগে তো বাথরুম কেন, কোনো ঘরের দরজার সামনে আমাকে মাথা হেঁট করতে হয়নি। কর্নেল, এই ব্যাপারটা আমার লক্ষ্য করতে ভুল হয়ে গেছে দেখছি।'

কর্নেল ওঁকে যেন আশ্বস্ত করতে চেয়েই বললেন, 'পৃথিবীর অধিকাংশ বিজ্ঞ মানুষই নিজের সম্পর্কে অসচেতন। ও নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই। পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের একটু হেরফের ঘটলে মানুষ বামন কিংবা দৈত্য হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, তাদের গায়ে প্রচন্ড শক্তিও এসে যায়।'

ডঃ গুন্টা আস্তে বললেন, 'তা ঠিক। কিন্তু আমার বয়স প্রায় পঞ্চান্ন হয়ে এল। এই বয়সে হঠাৎ আমার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড কেন এ খেল দেখাল বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য আমি অনেকের তুলনায় একটু লম্বা ছিলাম ছেলে-বেলা থেকেই। হঠাৎ একটা যেন দুর্ঘটনা ঘটল। আমি রাতারাতি শত ফুট উঁচু হলাম। অথচ খেয়াল পর্যন্ত করলাম না। কর্নেল, ব্যাপারটা ভারি গোলমেলে মনে হচ্ছে। আমি যাই।'

উনি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজা দিয়ে মাথা যতদূর সম্ভব নিচু করে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল তাকিয়ে রইলেন অবাক চোখে। আমিও।

ডঃ গুন্টা উঠেছিলেন পাশের ঘরে। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে সে ঘরের দরজায় তালাবন্ধ দেখলাম। বললাম, 'কর্নেল, ডঃ গুন্টা কি বাংলো ছেড়ে চলে গেলেন নাকি!'

কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। 'চলো জয়ন্ত, সেহরাগড় কোর্টের ধ্বংসাবশেষ দেখে আসি।'

এই বাংলোটা একেবারে সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর একটা টিলার গায়ে! নিচে ছোট্ট এক নদী। কাঠের সাঁকো পেরিয়ে বন জঙ্গল শুরু। দুর্গে পৌঁছুতে ঘন্টাখানেক লাগল।

কিন্তু যা ভেবেছিলাম, তাই ঘটল। প্রকৃতিবিদ দুর্গের ওপর থেকে বাইনোকুলারে কী পাখি দেখতে পেয়ে আমার অস্তিত্ব ভুলে গেলেন এবং ধ্বংসাবশেষের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেয়ালের ওপর বসে আমি নিচের জঙ্গলের শোভা দেখতে থাকলাম।

কতক্ষণ পরে পেছনে কী একটা শব্দে চমকে উঠে দেখি, ডঃ গুপ্টা একটা প্রকাণ্ড পাথর ধরে টানাটানি করছেন। আমি ভীষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

ডঃ গুপ্টা চাপা হুঙ্কার দিয়ে এক ঝটকায় বিশাল পাথরটা দুহাতে শূন্যে তুললেন। তারপর সেটা নিচে ছুড়ে ফেললেন। নিচে বিকট শব্দ করে পাথরটা পড়ল এবং গড়াতে গড়াতে চলল। ডঃ গুপ্টা হাত নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে তাকালেন আমার দিকে। মুখের চেহারায় কেমন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে আমার অস্বস্তি হল। বললাম, 'ডঃ গুপ্টা! আপনি দেখছি সুপারম্যানও বটে!

ডঃ গুপ্টা আমার কাছে এগিয়ে এসে সহাস্যে বললেন, 'মিঃ চৌধুরি, আমার ইচ্ছে করছে আপনাকে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলি!'

আঁতকে উঠে বললাম, 'সে কী! না—না। দয়া করে ইচ্ছেটা একটু সামলে রাখুন মশাই!'

'আমাকে ঘটোৎকচ মনে হচ্ছে না আপনার?'

'হচ্ছে। খুব হচ্ছে। আপনি ঘটোৎকচই বটে।'

ডঃ গুপ্টা ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, 'খুব ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'পেয়েছি বৈকি! আপনি অমন প্রকাণ্ড পাথরটা যেভাবে ছুড়ে ফেললেন!'

'আরও শক্তি দেখবেন নাকি?' বলে ডঃ গুপ্টা দুর্গের উঁচু পাঁচিলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর দুহাতে ঠেলতে শুরু করলেন। প্রকাণ্ড পাঁচিলটা সশব্দে ভেঙে পড়ল।

আমি এত ভয় পেয়ে গেছি যে পালিয়ে যাবার জন্য এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিরাপদ পথ খুঁজছি। ডঃ গুপ্টা ফটকের পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আগের মতো দুহাতের ধুলোময়লা ঝাড়তে ব্যস্ত। মুখে তৃপ্তির হাসি—কিন্তু কেমন অস্বাভাবিকতাও ফুটে আছে।

হঠাৎ উনি ফের চাপা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মারলেন এবং ওই লাফে অন্তত ফুট বিশেক উঁচু ফটকের মাথায় পৌঁছে গেলেন।

অমনি আমি নিচু পাঁচিলের ভাঙা অংশটা পেরিয়ে নামতে শুরু করলাম। এদিকটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে। অজস্র পাথর আর ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। ভাগ্যিস নিচের গভীর গড়খাইটা শুকনো ছিল। হাঁচড়-পাঁচড় করে ওপারে উঠতেই প্রকৃতিবিদের দেখা পেলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, 'ডঃ গুপ্টা সুপারম্যান হয়ে গেছেন! কী সব সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছেন, দেখলে বুদ্ধি সুদ্ধি ঘুলিয়ে যাবে!'

কর্নেল কিন্তু হাসছিলেন। বললেন, 'এখান থেকে বাইনোকুলারে আগাগোড়া সবটাই আমি দেখেছি ডার্লিং! তবে ডঃ গুপ্টাকে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই!'

'নেই মানে? আমাকে ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছে করছে বলেছিলেন!

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'সেই গল্পটা জানো তো? এক পাগল যাচ্ছে তাই পাগলামি শুরু করেছে। একটা লোক যেই বলেছে, ওরে! দেখিস যেন ঢিল ছোড়ে না—অমনি পাগল বলে উঠল, বাঃ! মনে পড়িয়ে দিয়েছে রে! বলে সে তখন ঢিল ছুড়তে লাগল। ডঃ গুপ্টাকে আমরা হয়তো ওইরকম মনে পড়িয়ে দিয়েছি। যাইহোক, এস—বাংলোয় ফেরা যাক।'...

বিকেলে লনে বসে আছি কর্নেলের সঙ্গে, সেই সময় ডঃ গুপ্টাকে ফিরতে দেখলাম। হাসিমুখে সম্ভাষণ করে বললেন, 'সেহরাগড় ফরেস্টকে জব্দ করে এলাম, কর্নেল! শ'খানেক শালগাছ উপড়েছি। একটা বাঘকে ছাতু করে দিয়েছি। একটা দাঁতাল হাতিকে আধমরা করে দিয়েছি। ঠ্যাং ভেঙে পড়ে আছে। আর কোর্টের অবস্থাটাও দেখে আসুন গিয়ে। একখানা দেয়ালও আস্ত নেই।'

কর্নেল বললেন, 'কিন্তু আপনার খাওয়া-দাওয়া? চৌকিদারকে আপনার খাবার টেবিলে রাখতে বলেছিলাম। দেখুন তো।'

ডঃ গুপ্টা বললেন, 'আরে তাই তো! আমার ক্ষিদে পেয়েছে যে! আমি খাব—প্রচুর।'

তারপর ধুপধাপ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে দৌড়ুলেন। কর্নেল চেঁচিয়ে বললেন, 'মাথায় ঠোক্কর লাগবে ডঃ গুপ্টা!'

ডঃ গুন্টা তক্ষুণি নিচু হয়ে বারান্দায় উঠলেন এবং দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর মিনিট দুই হয়েছে, পর্দা তুলে চৌকিদারকে ডাকতে থাকলেন। চৌকিদার এসে বলল, 'হুজুর!'

'এটুকু খানা তুমি আমার জন্য রেখেছ? আমি কি মাছি, না পিঁপড়ে?'

চৌকিদার বেজার মুখে বলল, 'আর তো কিছু নেই হুজুর।'

'চলো দেখি, তোমার কিচেনে কী আছে।

ডঃ গুন্টা কিচেনের দিকে গেলেন। চৌকিদারও গুটি-সুটি পেছনে পেছনে গেল। কিন্তু একটু পরে সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে। 'হুজুর! হুজুর! উনি আদমি না রাক্ষস? বাপরে বাপ! চাল ময়দা সবজি যা ছিল—সব আস্ত গিলে খাচ্ছেন যে! একটা ব্যবস্থা আপনারা করুণ হুজুর!'

ডঃ গুন্টার হাঁক শোনা গেল, 'চৌকিদার! চৌকিদার!'

চৌকিদার চাপা গলায় বলল, 'দোষ-গলতি মাফ করবেন হুজুর। আমি এখনি ওপরয়ালার কাছে রিপোর্ট করতে চললুম।'

বেচারা চৌকিদার প্রায় লেজ তুলে দৌড়ুনোর মতো গেট দিয়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর কিচেনের দিক থেকে ডঃ গুন্টা বেরিয়ে এলেন। মুখে একরাশ ময়দা লেগে আছে। বললেন, 'এ কী বিচ্ছিরি খিদে বলুন তো কর্নেল! ইচ্ছে করছে, আপনাদেরও খেয়ে ফেলি।'

কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'জঙ্গলে গিয়ে হরিণ-টরিণ ধরে খান ডঃ গুন্টা। কী আর করবেন?'

ডঃ গুন্টা সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন। 'আরে তাই তো বটে!' বলে মাটি কাঁপিয়ে বাংলোর প্রাঙ্গণের ধারে উঁচু বেড়া মড়মড় করে ভেঙে বেরিয়ে গেলেন।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'কর্নেল! ব্যাপারটা বড্ড ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে! চলুন, এখান থেকে চলে যাই আমরা। এ যে সত্যি ঘটোৎকচের কান্ড বেধে গেল।'

কর্নেল শুধু হাসলেন। আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না।

ঘন্টা দুই পরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাংলোয় বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মশার বড্ড জ্বালাতন। তাই আমরা ঘরে বসে আছি। ডঃ গুন্টার আর পাত্তা নেই। বলছিলাম, 'এতক্ষণ হয়তো জঙ্গলের সব হরিণ ওঁর পেটে চলে গেলে।' এমন সময় জিপের শব্দ হল বাইরে।

দুজন ফরেস্ট অফিসার আর একদল গার্ড হন্তদন্ত এসে গেলেন। রেঞ্জার সায়েব আমার চেনা। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কর্নেল! এক অদ্ভুত কান্ড ঘটেছে। আপনার পাশের ঘরের সেই লম্বা ভদ্রলোক…'

কর্নেল কথা কেড়ে বললেন, 'বুঝেছি। জঙ্গলে হরিণের পাল সাবাড় করে বেড়াচ্ছেন।'

রেঞ্জার বললেন, 'দুঃখের কথা, আমরা ওঁকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছি।

'সে কী!'

'গুলি না করে উপায় ছিল না। উনি একজন ফরেস্ট গার্ডকে আছাড় মেরে খুন করেছেন। সে এক বীভৎস দৃশ্য কর্নেল! লোকটা একেবারে নরদানব কিংকং বললেই চলে।'

কর্নেল আস্তে বললেন, 'ঠিকই করেছেন। তা না হলে এবার ভদ্রলোককে আটকানো কঠিন হত। ক্রমশ ওঁর ভেতর একটা ভয়ংকর শক্তি জেগে উঠছিল। এরপর জঙ্গল ছেড়ে হয়তো উনি বসতী এলাকায় গিয়ে ঢুকতেন। তারপর আরও বীভৎস ঘটনা ঘটত।'

কথা নামিয়ে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। 'চলুন তো, ওঁর ডেডবডিটা দেখে আসি।'

জিপে চেপে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলুম। মাইল দুই এগিয়ে বাঁদিকে একখানে আগুন জ্বলতে দেখা গেল। রেঞ্জার বললেন, 'ওই যে ওখানে। ডেডবডির পাহারায় দুজনকে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

কাঠকুটো জেবলে লোক দুটো আসলে ভয় তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। আমাদের দেখে সাহস ফিরে পেল। তারা বন দফতরেরই কর্মী। একজনের হাতে একটা বন্দুক, অন্য হাতের হাতে নিছক বল্লম। মুখে প্রচন্ড আতঙ্কের ছাপ লেগে আছে! একটু তফাতে দলাপাকানো রক্তাক্ত একটা লাস পড়ে ছিল। রেঞ্জার টর্চের আলোয় সেটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা ফরেস্টগার্ড মনি সিংয়ের ডেডবডি। কী অবস্থা হয়েছে দেখুন।'

কর্নেল বললেন, 'ডঃ গুন্টার ডেডবডি কোথায়?'

রেঞ্জার পা বাড়িয়ে বললেন, 'আসুন, দেখাচ্ছি।'

জায়গাটা খোলামেলা। একটু এগিয়ে টর্চের আলোয় একটা ছোট্ট নদী দেখা গেল। বালি আর পাথরে ভর্তি। রেঞ্জার অবাক হয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! ডেডবডিটা কোথায় গেল? জানোয়ারে টেনে নিয়ে গেল না তো?'

বালির ওপর একটু রক্তের ছাপ চোখে পড়ল। কর্নেল টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে জায়গাটা দেখে বললেন, 'নাঃ। টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু···আশ্চর্য তো!'

'কী কর্নেল?'

'মনে হচ্ছে, ডঃ গুন্টা মারা যায়নি। দিব্যি পায়ে হেঁটে চলে গেছেন।'

'অসম্ভব! গুলি করার পর আমরা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখেছিলুম। দেহে প্রাণ ছিল না। দুটো গুলিই হার্টে লেগেছিল।'

যে দুটি লোক পাহারায় ছিল, তাদের একজন বলল, 'কী একটা শব্দ শুনেছিলুম কিছুক্ষণ আগে। টর্চ জেবলে কিন্তু কিছু দেখতে পাইনি।'

অন্য লোকটি বলল, 'আমি ভেবেছিলুম কোনো জানোয়ার।'

রেঞ্জার তাদের খুব বকাবকি করলেন। তারা আমতা-আমতা করছিল। বুঝতে পারছিলুম, ওদের বকাবকি করা বৃথা। বেচারারা ভয়ে আধমরা হয়ে বসে ছিল। যদি দেখত, ডঃ গুন্টার মরা হেঁটে যাচ্ছে, তাদের ভিরমি খেয়ে পড়ে থাকতে হত।

কর্নেল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে নদীর ওপার পর্যন্ত গেলেন। আমরাও ওঁর সঙ্গে গেলুম। কিন্তু তারপর কঠিন পাথুরে মাটিতে আর কোনো ছাপ দেখা গেল না। কর্নেল উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'সেহরাগড় টাউনশিপের লোকেদের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।'···

ফরেস্টবাংলোয় ফিরে এ রাতে আর অন্ধকার বনভূমির সৌন্দর্য দেখার মন ছিল না। তাছাড়া মশার খুব উৎপাত সে কথা আগেই বলেছি।

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাটাচ্ছিলুম। কর্নেলের নাক ডাকছিল যথারীতি। এক সময় হঠাৎ বাইরে কী একটা একটা ধাক্কা শব্দ হল। অমনি কর্নেলের নাক ডাকাও থেমে গেল। ওঁর ঘুম বরাবর এমনি পাতলা। ওদিকে পাশের ঘরে কেউ যেন চুপিচুপি তালা খুলছে। তারপর সাবধানে দরজা খুলল। কর্নেলের নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। তারপর টেবিলবাতিটা জ্বলে উঠল। ফিস ফিস করে বললুম, 'কর্নেল! পাশের ঘরে কে যেন ঢুকল।'

কর্নেলও ফিসফিস করে বললেন, 'চুপ্!'

উনি বারান্দার দিকের জানালার পর্দা তুলে উঁকি দিলেন। আমিও ওঁর কাছে গিয়ে উঁকি দিলুম। বারান্দায় আলো আছে। একটু পরে শিউরে উঠে দেখি, পাশের ঘর

[পরবর্তী অংশ ৫৭ পৃষ্ঠায়]

বিনামূল্যে গ্রাহক হওয়ার সুযোগ

কি কি করতে হবে

এই পাখিটির নাম কি? পাখিটি সম্পর্কে এক পাতার একটি রচনা পাঠাতে হবে ২০শে জুনের মধ্যে। শ্রেষ্ঠ দু'জনকে এক বছরের জন্য বিনামূল্যে গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

আলবার্ট আইনস্টাইন

১৮৭৯ সালে জার্মানীতে আইনস্টাইনের জন্ম হয়। তার সময়ে তিনি বেশ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ১৯৩৩ সালে আইনস্টাইন জার্মানী ছেড়ে আমেরিকায় চলে আসেন; তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়; ফলে জার্মানীতে বাস করা তেমন নিরাপদ ছিল না। ১৯৪০-এ তিনি আমেরিকার নাগরিক হয়ে গেলেন। আপেক্ষিকতাবাদের জন্যই আইনস্টাইন সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত। বিভিন্ন বস্তুর গতিবেগ নিয়ে গড়ে উঠেছিল আপেক্ষিকতার নানা তত্ত্ব।

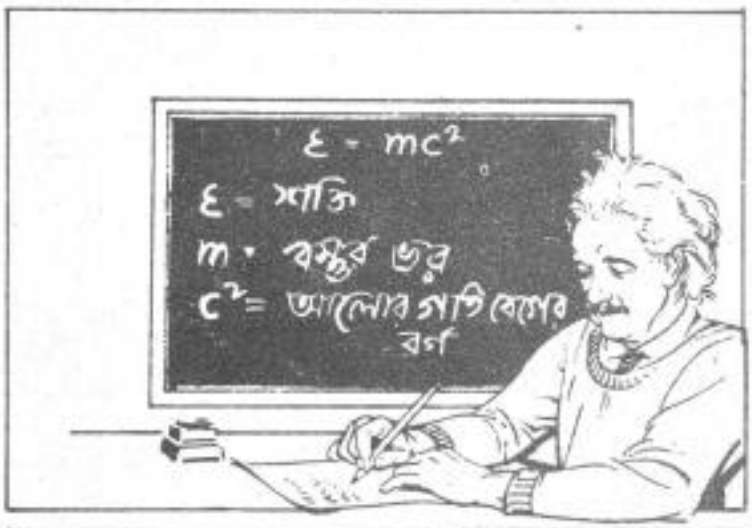

ওর জীবন বেশ সুখেই কাটতো। মা তাঁর বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গান বাজনার চর্চা করতেন। আলবার্টের শুনতে বেশ ভালোই লাগতো।

মিসেস আইনস্টাইন খুব সুন্দর পিয়ানো বাজাতে পারতেন। কিন্তু বেহালা শুনতে আলবার্টের আরো বেশি ভালো লাগতো।

একদিন ...
এটা তোমার! তোমাকে বেহালা শিখতে হবে।

সুতরাং আলবার্ট গেলো সঙ্গীত শিক্ষকের কাছে।
প্র্যাকটিশ, প্র্যাকটিশ, আর প্র্যাকটিশ!

বেহালা বাজানো আলবার্টের কাছে বরাবরই খুব আনন্দের ছিলো।
বাঃ খুব চমৎকার সুর তো!
ধন্যবাদ, মা
খুব তাড়াতাড়ি বেহালা বাজাতে ভালো শিখে গেলো সে।

বিস্ময়ের নোট বই

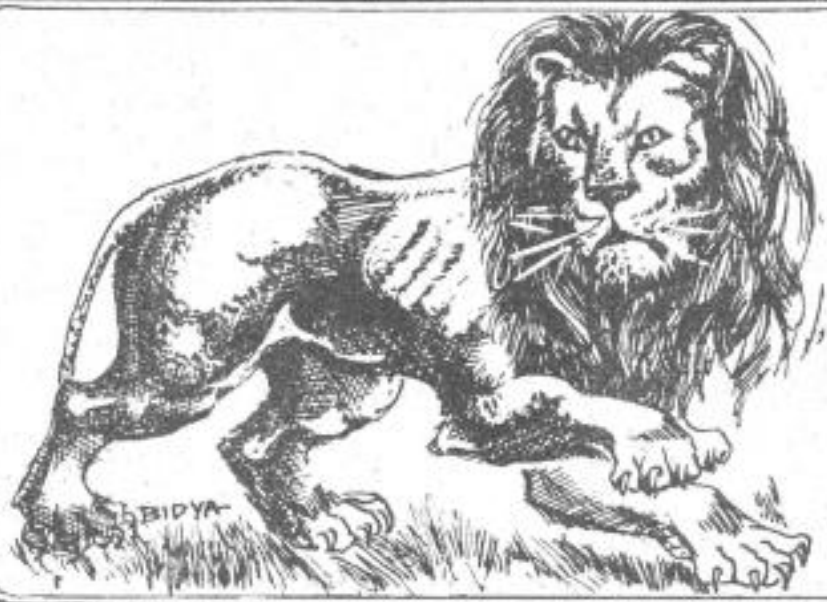

এক এক পশুর আচার ব্যবহার এক এক রকম। পশুরাজ সিংহ তিন পায়ে দাঁড়িয়ে শিকার করে। চতুর্থ থাবা দিয়ে সে আক্রমণ করে। কিন্তু বাঘ ও চিতা দু পায়ে দাঁড়িয়ে সামনের দু পা'র সাহায্যে আঘাত করে শিকারকে।

উত্তর আমেরিকার ডোরাকাটা কাঠ বিড়ালীরা গাছের ফোকরে বাদাম সঞ্চয় করে। চিতা বাঘেরা খাদ্যাবশিষ্ট ঝুলিয়ে রাখে গাছের উঁচু ডালে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের জন্য। তেমনি কাঠ ঠোকরারা ওক গাছে ছোট ছোট গর্ত করে তার মধ্যে বাদাম সঞ্চয় করে রাখে।

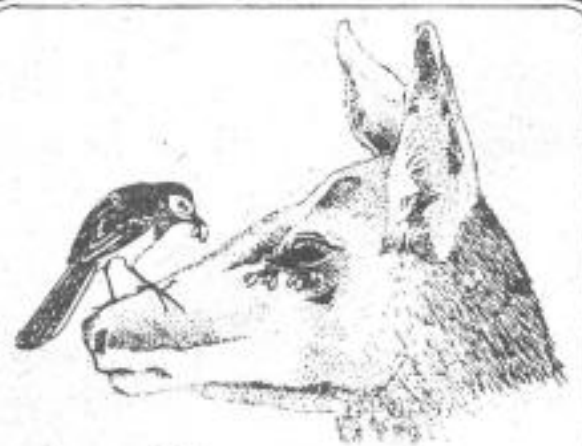

পশু ও পাখীদের মধ্যে অদ্ভুত বন্ধুত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ রকম এক বিচিত্র বন্ধুত্ব আছে হরিণ ও দোয়েল বা খঞ্জনা পাখীর মধ্যে। হরিণের নাকের উপর বসে চোখের জমা পিচুটি ও নোংরা খুটে খুটে খায় দোয়েল। একই সঙ্গে দোয়েল তার খাদ্য মেটায় অন্যদিকে হরিণের ও চোখ পরিষ্কার হয়।

পৃথিবীতে এমন সব ঘটনা ঘটে যার বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলেনা, বিজ্ঞানও সদুত্তর দিতে পারেনা……অথচ ভৌতিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না……এমনই রহস্যময় সত্য ঘটনা……

পার্থ দত্ত

অভিশপ্ত শহর গেডি

আজও রহস্য

শহরের নাম গেডি। আফ্রিকার মোম্বাসার উত্তর উপকূলে কেনিয়ার শহর এই গেডি, যেখানে জীবিত কোন মানুষ বাস করে না। সরীসৃপ আর ভূতেদের স্বর্গরাজ্য সেই শহরটা। পড়তে গিয়ে তোমাদের হুমহুম করছে, তাই না? এটা কোন ভূতের গল্প নয়, সত্য ঘটনা। কেনিয়া ফেরত আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে শোনা এই গল্প। এই শহরে মানুষের ছায়া কেন পড়ে না, কেউ জানে না। কচিৎ কেউ পথ ভুলে, কিংবা অতি উৎসাহী লোক ছাড়া এই গেডি শহরে পা ফেলতে সাহস পায় না। গেডির পার্শ্ববর্তী শহরগুলোর স্থানীয় বাসিন্দারা জানে, এই মৃত পরিত্যক্ত শহর বড় ভয়ঙ্কর, বড় সাংঘাতিক, বড় নিষ্ঠুর কারোর সাথে খাতির নেই। শহরের চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ, মাঝে মাঝে পোড়ো বাড়ির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে, সে সবের ছবি আঁকলে,. কিংবা সেখানে অযাচিত ভাবে কেউ প্রবেশ করলে তার আর রেহাই নেই। শুধু তার একারই বা কেন বলছি, শুনেছি তার পরিবারের কেউ বেঁচে থাকে না শেষ পর্যন্ত, এমনি অভিশপ্ত এই গেডি শহর!

এতো সব বাধা নিষেধ, জনশ্রুতি থাকা সত্বেও একদিন এক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা শিল্পী করলো কি জানো? এক রকম জোর করেই সেই গেডি শহরে গেলেন ছবি আঁকতে, ছবি আঁকা খুব শখ ছিলো তাঁর। মহিলাটি ভীষণ জেদী ছিলেন, নিজে যা ভালো বুঝতেন তাই করতেন। গেডি শহরে তাঁর যাওয়ার সিদ্ধান্তও ঐ জেদের বশে। সঙ্গে নিলেন তাঁর একমাত্র তরুণী কন্যা এবং আরো দুজন ব্যক্তি, তাঁরা স্বামী স্ত্রী। সবাই শিল্পী, ভালো ছবি আঁকিয়ে সবাই। এঁরা সবাই বাস্তববাদী লোক, এঁদের মনে কুসংস্কারের স্থান নেই। দুঃসাহসিক অভিযানে আনন্দ পান এঁরা।

তা সত্বেও স্থানীয় লোকেরা এঁদের বাধা দিলো তাদের সাধ্য মতো। কিন্তু এঁরা তাদের বাধা নিষেধ উপেক্ষা করে অকুস্থলের দিকে রওনা দিলেন একদিন। গেডি শহরে পৌঁছেই তাঁরা তাঁদের সময়ের সদ্ব্যবহার করলেন ছুটিয়ে। সারাটা দিন ধরে তাঁরা সেই মৃত শহরের ছবি আঁকলেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। ছবি আঁকতে সবাই ব্যস্ত, হঠাৎ তাঁদের সবাইকে চমকে দিয়ে একজন কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ সেখানে মুহূর্তের জন্য একবার হাজির হয়ে নিমিষে মিলিয়ে গেলো হাওয়ায়। তারপর অন্য আর একজন কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ আর একটু এগিয়ে গেলেন। তাদের সেই বেআইনী কাজ করার জন্য ভর্ৎসনা করলো। তাঁরা তখন দ্বিতীয় কৃষ্ণকায় লোকটিকে কিন্তু অভুক্ত খাদ্য দিয়ে বিদায় করে দিলেন।

তারপরেই দেখা গেলো সহসা সন্ধ্যা নেমে এলো সেখানে। সন্ধ্যা নেমে গেছে দেখে তাঁরা তখন চট্‌পট্‌ তল্পি তল্পা গুটিয়ে সেই রহস্যময় গেডি শহর ত্যাগ করার জন্য যে যার গাড়ীতে উঠে বসলেন। কিন্তু পথের মাঝে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। গেডি শহর পেরিয়ে আসা মাত্র আকাশ ভেঙ্গে পড়া সন্ধ্যার অন্ধকারটা সরে গিয়ে আবার বিকেলের রোদ্দুরে ফুটে উঠলো। তাজ্জব ব্যাপার যেন।

তবু তাঁরা ভয় পেলেন না, কিংবা এতটুকুও দমলেন না। পর পর বেশ কয়েকদিন সেই মৃত গেডি শহরে গিয়ে সেখান কার দর্শনীয় স্থানের প্রচুর ছবি আঁকলেন খোশ মেজাজে। তারপর একদিন মন কানায় কানায় ভরে গেলে পর সেখান থেকে যে যার বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

দেশে ফিরে গিয়ে কয়েক মাস মোটামুটি শান্তিতেই কাটলো। তারপর শুরু হলো তাঁদের জীবনে চরম বিপর্যয়। সেই শ্বেতাঙ্গিনী শিল্পী মহিলার হঠাৎ হলো কি একদিন, খামোকা ডান পায়ের গোড়ালি ভেঙ্গে গিয়ে জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে গেলেন। এখানেই বিপর্যয়ের শেষ নয়, তাঁর মেয়ে ছিলো ভালো সুটার। রাইফেল পায়ের ওপর রেখে ঝাঁরপোঁছ করছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য, সেফ্‌টি ক্যাচ থাকা সত্বেও হঠাৎ সেই রাইফেল থেকে গুলি বেরিয়ে তার তলপেটে লাগাতে সাংঘাতিক ভাবে জখম হয় সে।

এ তো হলো সেই জেদী শিল্পী মহিলার বিপর্যয়ের কাহিনী। তাঁর সাথী সেই দম্পতীর কাহিনী আরো বেশি করুণ, আরো বেশি মর্মান্তিক। সেই ভদ্রমহিলা ঘটনার কয়েকদিন পরে সেই দম্পতীর চিঠি পেলেন। তিনি, লিখেছেন, গেডী শহরের একটা ছবি দেওয়ালে টাঙাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যান তিনি, সাংঘাতিক ভাবে তিনি তাঁর মেরুদণ্ডে আঘাত পান। ছ'মাস হাসপাতালে থেকে সম্প্রতি বাড়ি ফিরেছেন বলতে গেলে এক রকম পঙ্গু হয়ে। শুধু কি তাই? তাঁর স্বামী বেচারাকে কয়েকদিন আগে তাঁদের বাগানের জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে ডান হাতটিকে জন্মের মতো খোয়াতে হয়েছে।

সেই সব ভয়ঙ্কর খবর পেয়ে শিল্পী মহিলা দারুন ভয় পেয়ে গেলেন। ফেরত ডাকে সেই দম্পতিকে চিঠি লিখে জানালেন, পত্রপাঠ তিনি যেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি মনে মনে স্থির করে নিলেন, সেই মৃত গেডি শহরে ফিরে গিয়ে এর একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

তারপর একদিন রাতে শিল্পী মহিলার চোখে ঘুম আসছিল না, এক সময় সেই গেডি শহরে দেখা প্রথম বৃদ্ধটিকে তাঁর মশারির পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। বৃদ্ধটি তখন বিড়বিড় করে বলছিল, তোমাদের রেহাই নেই, কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তবে এর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো, গেডি শহরে গিয়ে তোমাদের আঁকা সব ছবিগুলো পুড়িয়ে ফেলা, তবেই হয়তো এযাত্রায় বেঁচে যেতে পারো। তা না হলে সেখানকার প্রেতাত্মাদের কোপে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য।

পরদিন তুমুল ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে সেই চারজন ভীত সন্ত্রস্থ নরনারী সেই অভিশপ্ত মৃত গেডি শহরে গিয়ে পেঁছিলো, সঙ্গে নিয়ে এলো তাদের আঁকা সব ছবি। সেই ছবিগুলো তাঁরা নিজের হাতে পুড়িয়ে ফেললেন, যে হাতে একদা তাঁরা ছবিগুলো খুব যত্ন করে এঁকেছিলেন।

কিন্তু সেই শিল্পী মহিলা একটা ছবি সঙ্গে আনতে পারেননি। আনবেনই বা কি করে? সেই ছবিটা যে তিনি জনৈক ধনী মার্কিন ভদ্রলোককে বিক্রী করে দেন, সেই ভদ্র-লোক এখন আমেরিকায় তাঁর বাসস্থানে।

কয়েক দিন পরে খবরের কাগজের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে শিল্পী মহিলা শিউরে উঠলেন। তাঁর আঁকা গেডি শহরের ছবির ক্রেতা সেই মার্কিন ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাসহ তাঁর শহরের বাড়িতে ভয়াবহ এক অগ্নিকান্ডে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। দুঃসংবাদটা পড়তে পড়তে মহিলার দৃষ্টি কেমন ঝাপসা হয়ে আসে। তাঁর চারিদিকে নেমে এলো কালো শ্লেটের মতো ঘন অন্ধকার। দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। অসম্ভব যন্ত্রণা বুকে। চেয়ারে বসে থাকতে থাকতেই প্রাণটা তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে যায়, মেঝের ওপর ঢলে পড়েন।

মৃত গেডি শহরের ক্রুদ্ধ প্রেতাত্মারা তাদের অলিখিত আইন অমান্যকারী শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলির প্রতি বদলা নিতে একটুও কার্পন্য করেনি। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে আজকের এই বিজ্ঞানের যুগেও কি এসব বিশ্বাস করতে হবে? জানি না এ রহস্যের সমাধান কোন দিন হবে কিনা?

ধারাবাহিক বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস

এক/সময় বাদুকরের আবির্ভাব

প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে অবনী কাঁপছে থরথর।

ঝড় বইছে কোবা পর্বত ঘিরে। গুঙিয়ে উঠছে যেন অতলস্পর্শী খাদের তলদেশ থেকে। ঠিক যেন অশরীরীদের সম্মিলিত কান্না, আর্তনাদ। বুক চাপড়ে হাহাকার করছে বৃদ্ধি কোবা পর্বতের অগুন্তি কায়াহীনরা। ভৌতিক বিলাপ উত্থিত হচ্ছে নরকের পাতাল-গর্ভ থেকে।

মাথার ওপর কুন্ডলী খেয়ে, পাক খেতে খেতে ধেয়ে যাচ্ছে মেঘের রাশি। গোধূলির আলো আঁধারিতে ভয়ানক আলোয় আলোকিত মেঘপুঞ্জ। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ লকলকিয়ে উঠছে অপার্থিব রঙে রঙিন রাশি রাশি মেঘের মধ্যে, দামিনী নয়, যেন দানবের হিলহিলে তরবারি, প্রদীপ্ত, চোখ ঝলসানো।

টারজন তো জানে, বৃষ্টি শুরু হলেই পাহাড়ের গা এমন পিছল হয়ে যাবে যে দুরূহ হয়ে উঠবে আরোহণ পর্ব। তবুও সে উঠছে পাহাড়ের গা বেয়ে। বিদ্যুৎগর্ভ ঐ মেঘপুঞ্জ থেকে বজ্র অবতীর্ণ হতে পারে পর্বতের গায়ে যে কোন স্থানে—তাও জানে বইকি টারজন। বিপজ্জনক পর্বতগাত্র বেয়ে তবুও সে উঠছে তো উঠছেই – অকুতোভয়,

দুর্দান্ত, ডানপিটে টারজানের গতিরোধ করার ক্ষমতা নেই বিশ্বের কোনো শক্তির। কিসের প্রত্যাশায় এই দুর্গম অভিযান, সে নিজেও তা জানেনা। জানে না, কি পাবে অভিযানের শেষে। কিন্তু কিছু যে একটা পাবেই পাণ্ডব-বর্জিত বুক কাঁপানো এই ভয়ংকর দুরারোহ পর্বতেই, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। তাই, সামান্যতম খাঁজ আর ফাটলেও পা রেখে, স্রেফ আঙুলের জোরে খাঁজ আর ফাটল ধরে ধরে বিপুল দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে পর্বতের শীর্ষদেশ অভিমুখে।

আবহাওয়া প্রতিকূল অবস্থায় চলে যাচ্ছে; এমন পরিস্থিতি দেখলেই যে কোনো সাধারণ পর্বতারোহী অভিযান শিকেয় তুলে রেখে নেমে আসতো নিম্নভূমিতে। আশ্রয় নিত নিরাপদ আশ্রয়ে। ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত শিবিরে বসে কাটিয়ে দিত সময়টা। সভ্য দুনিয়ার তথাকথিত কোনো সভ্য মানুষ এই অসম্ভবের অভিযানে অগ্রসর হ'তনা। নিছক একটা স্বপ্নের তাগিদে, আবছা অনুভূতির তাড়নার কোনো শহরবাসী একশ মাইল পায়ে হেঁটে পেরিয়ে আসত না। কিন্তু বহুবছর অরণ্যে কাটিয়ে শাণিত হয়ে উঠেছে টারজনের সহজাত অনুভূতিবোধ—তাই অপরিসীম আস্থা এই অনুভূতিবোধের ওপর—এরই তাড়নায় যেখানে খুশী যেতে সে প্রস্তুত। অভিযানের অন্তে যত বিপদই সঞ্চিত থাকুক না কেন—পরোয়া করেনা টারজন অফ দ্য এপ্‌স্‌।

ক্ষণেকের জন্যে বিদ্যুৎঝলকে ঝলকিত হল কোবাপর্বত, মেদিনী কাঁপিয়ে বাজ পড়ল কাছেই গুরু গুরু গুম্‌ গুম্‌ শব্দে প্রকম্পিত হ'ল বিশাল পর্বত। বনমানুষের রাজা এবার সত্যিই বুঝি নারকীয় সংকটের সম্মুখীন হতে চলেছে।

টিকটিকি ছাড়া এ পাহাড় বেয়ে কেউ উঠতে পারে?

পারে বৈকি। একজনই পারে। নাম তার টারজন। টিকটিকির মতই খাড়াই পর্বতের গা বেয়ে তাই সে তবুও উঠে যাচ্ছে। তবে অতিশয় মন্থর গতিতে। এক ইঞ্চি করে। অচিরে আঙুল ঠেকল একটা খোঁচা পাথরে। সবল আঙুলে তা আঁকড়ে ভারী দেহটাকে অসীম শক্তিতে টেনে তুলে আনল একটা পাথুরে চাতালে। বেশ চওড়া চাতাল। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালো চারিপাশে। এঁকে বেঁকে বিদ্যুৎ রেখা নেমে এল মেঘপুঞ্জ ভেদ করে—বাজ পড়ল পাহাড়ের অপর দিকে। সেকেন্ড কয়েক পরেই লক্ষ করতালি বাজিয়ে দানবিক অট্টহাসিতে দিকবিদিক কাঁপিয়ে ধেয়ে এল বজ্রধ্বনি। ঐ দুর্যোগের রাতে খাঁড়াই পর্বতের গায়ে এ হেন শব্দে বিস্ফোরণে আতংকে রক্ত জমে যাওয়ার কথা, কিন্তু টারজন তো সাধারণ মানব নয়। অবিচল রইল তার নির্ভীক অন্তর। জঙ্গল অধিপতি বলেই বুঝল শুধু, এই মুহূর্তে আরো ওপরে ওঠা সমীচীন হবে না।

চাতালটা দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চওড়ায় প্রায় বিশ ফুট। পাতলা ঘাসে ছাওয়া। হেথায় হোথায় পড়ে বিশালাকৃতি নুড়ি পাথরের মত গোলাকার পাথর। এক প্রান্তে সামান্য ঝোপ, একটিমাত্র বিদঘুটে গাছ কোন মতে টিকে আছে সেখানে, অগভীর মৃত্তিকাস্তরে শেকড় চালনা করে খাড়া রেখেছে নিজেকে। চাতালের পেছন দিকে খাড়াই পাহাড় পাঁচিলের মত সটান উঠে গেছে ওপর দিকে। এই প্রাচীর সদৃশ পর্বতগাত্রে পিঠ দিয়ে বসল টারজন, ঝড়ের অবসানের প্রতীক্ষায়।

মাথার ওপর অব্যাহত রইল বিজলী লহরী। গুরু গম্ভীর নিনাদে থর থর করে কাঁপতে লাগল পাহাড় পর্বত আকাশ বাতাস। তারপরেই, আচম্বিতে, ধবধবে সাদা হয়ে গেল মহীতল—দধীচির হাড়ে গড়া আঁকাবাঁকা একটা বিপুল বজ্রের প্রান্তদেশ ছুঁয়ে গেল চাতালের কিনারা—টারজন যেখানে বসে, তার অদূরে, এত কাছে যে টারজনের মত ডাকাবুকো মানুষও সচমকে সন্ত্রস্ত না হয়ে পারলনা, আরও ঘেঁসে বসল পাহাড় প্রাচীরের গায়ে। মুহূর্তের জন্যে চোখে ধাঁধা দেখেছিল টারজন, যেন অন্ধ হয়ে গেছিল প্রথম বিদ্যুতালোকে, পরমুহূর্তেই কানের পর্দা যেন চৌচির হয়ে গেল মাথার ওপরকার বজ্র বিস্ফোরণে। সম্বিৎ ফিরে আসার পর কি দেখল টারজন?

পাথুরে চাতালের কিনারায় দাউ দাউ করে জ্বলছে নিঃসঙ্গ কদাকার বৃক্ষটি। আগুনের পটভূমিকায়, লেলিহান অগ্নিশিখার সামনে, নিষ্কম্প দেহে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি পুরুষমূর্তি!

প্রচন্ড হাওয়ায় লটপট করে উড়ছে নবাগতের কৃষ্ণবর্ণ আলখাল্লা, লম্বা সোনালী চুল। সমস্ত অবয়ব ঘিরে একটা চাপাদ্যুতি, আশ্চর্য প্রভা। পেছনকার আগুনের আভা নয়। বিস্ফারিত হচ্ছে শরীর থেকে। দুচোখকে বিশ্বাস করতে পারল না টারজন। সত্যিই একটা মানুষ দেখছে, না, দৃষ্টিবিভ্রম? চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ফল?

সহসা কথা ফুটল আগন্তুকের কণ্ঠে, এমন সহজ সুরে

বললে যেন অনেকদিন পরে দেখা হল পুরোনো দোস্তর সঙ্গে, 'এই তো টারজন ঠিক সময়েই এসে গেছো দেখছি।'

পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এল বিচিত্র প্রভামন্ডিত অদ্ভুত মানুষটা। অজান্তেই টারজনের হাত চলে গেল কোমরের খাপে গোঁজা ছুরির হাতলে। তড়াক করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছে, এমন সময়ে লোকটা সহজভাবে বসে পড়ল তার ঠিক সামনেই। হুঁশিয়ার চোখে নির্নিমেষে চেয়ে রইল টারজন।

শুধোয় ধীর মন্থর কণ্ঠে, 'আমার প্রতীক্ষাতেই ছিলেন মনে হচ্ছে?'

'ঠিক প্রতীক্ষায় ছিলাম বলাটা ঠিক হবেনা', মৃদু হাসল বিচিত্র পুরুষ, 'কিন্তু আশায় ছিলাম, তুমি আসবেই। আমার নাম বোরোভিয়াক।'

মুহূর্তের মধ্যে টারজানের শাণিত চক্ষু দেখে নিল লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। পরনে মিহি পরিচ্ছদ, এত ফিনফিনে কাপড় বনমানব নৃপতি কখনো দেখেনি। ধাতুর সুতোর কারুকাজ রয়েছে আলখাল্লায়। হাতে আঁটসাট দস্তানার ওপর আঙুলে বেশ কয়েকটা রুপোলী আংটি। কোমরে ধাতুর বেল্ট, তাতে ঝুলছে একটা কালো থলে। বয়স প্রায় চল্লিশ। দুর্বল আকৃতি। আপাততঃ লোকটা বন্ধুর মত কথা বলছে বটে, হাতাহাতি আরম্ভ হলে অনায়াসেই কুপোকাৎ করা যাবে খন।

বৃষ্টি শুরু হ'ল। পুরো পর্বতের ওপর মুষলধারে ঝমাঝম্ শব্দে আছড়ে পড়েছে বৃষ্টি। বোরোভিয়াক তাতে বিচলিত হয়েছে বলে মনে হ'ল না। অদ্ভুত ভঙ্গিমার শুধু দুটো হাত তুলল মাথার ওপর।

অবাক কাণ্ড। একটু আগেও বৃষ্টিধারায় সর্বাঙ্গ সিক্ত হচ্ছিল টারজনের। কিন্তু কই, এখন তো কাজ হচ্ছে না? গায়ে একদম জল পড়ছে না?

কেন পড়ছে না দেখতে গিয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল টারজনের। ঠিক যেন একটা অদৃশ্য গম্বুজ টানা রয়েছে দুজনকে ঘিরে, দুই থেকে তিন ফুট ব্যাসের গম্বুজ। জল পড়ছে বাইরে, ভেতরে নয়?

খর চাহনি মেলে ধরে টারজন আগন্তুকের পানে।

প্রশ্নটা মুখে উচ্চারিত হওয়ার আগেই মন দিয়ে বুঝে নেয় বোরোভিয়াক।

জবাব দেয় স্মিতমুখে, 'প্রযুক্তি বিদ্যার কারসাজি, ম্যাজিক নয়, তন্ত্রমন্ত্র ঝাড়ফুঁক নয়, টারজন, আমি আসছি ভবিষ্যৎ থেকে, ২২৬০ সাল থেকে, তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায়।'

অবাক হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখালোনা টারজন। লোকটাকে দেখে ইস্তক মনে হয়েছে, সৃষ্টি ছাড়া জীব। কাজেই মিথ্যে বলছে বলে মনে হয় না। সহজাত অনুভূতি বলে প্রথম থেকেই মনে হয়েছিল, অনেক কিছু সৃষ্টিছাড়া ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হবে নিরালা দুর্গম এই পর্বতে তাই চেয়ে রইল নির্বিকারভাবে। থলি থেকে একটা পুচকে যন্ত্র বার করে বেরোভিয়াক। দেখতে অনেকটা ক্ষুদে টেলিভিশন সেটের মত। ইঞ্চি দুয়েক লম্বা।

বলে, 'যে সময়কাল থেকে আসছি, সেই সময়কালে যুদ্ধ চলছে এখন। মঙ্গলগ্রহের উপনিবেশ থেকে এসেছে এক উন্মাদ। নাম, শ্যানটন। বানিয়েছে একটা রোবট বাহিনী, উদ্দেশ্য, সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ব করবে। বদ্ধ পাগল! পরিণাম যা হবার তা হয়েছে। রোবটবাহিনী শ্যানটনকেই নিপাত করেছে সবার আগে। এখন উঠে পড়ে লেগেছে সৌরজগতের সমস্ত মানুষ নিপাত করার জন্যে। মানব জাতির শেষ ঘনিয়ে আসবে যদি ওরা সফল হয়।

পুচকে যন্ত্রের পর্দায় দেখা গেল সেই দৃশ্য। ভয়ানক হত্যা দৃশ্য! দীর্ঘকায় রোবট বাহিনী রশ্মি রাইফেল নিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে দীর্ঘ পদক্ষেপে, ধাতুর তৈরী লম্বা লম্বা ডাঁটার মত হাত আর পা চকচক করছে রশ্মি আভায়। দলে দলে মানুষ মরছে অসহায়ভাবে।

ভুরু কুঁচকে ওঠে টারজনের। এ দৃশ্য দেখা যায় না। ফুলে ওঠে হাত পায়ের মাংসপেশী।

বলে বজ্রকঠিন কণ্ঠে, 'লড়ে মরছে না কেন?'

লড়বার শক্তি হারিয়েছে বলে। দেহের শক্তি অথবা ইচ্ছাশক্তি দুটোরই প্রচণ্ড অভাব আমার সময়কালের মানুষের মধ্যে। শরীর যাদের ইস্পাত দিয়ে তৈরী, যন্ত্রের মত হিমশীতল জিঘাংসায় যারা নরহত্যা করে পোকামাকড় মারার মত তাদের সঙ্গে লড়বার মানুষ আর নেই, টারজান।'

বোরোভিয়াকের ফুরফুরে আকৃতি দেখেই হাড়ে হাড়ে তা মালুম হয়েছে টারজানের। ভবিষ্যতের মানুষ! লড়বার মত কিছুই তো আর রাখেনি। লড়ে বাঁচতে হয় না বলেই লড়াই করতেও ভুলে মেরে দিয়েছে।

'উপায় অবশ্য এখনো একটা আছে', বলে বোরোভিয়ক, 'দ্বাবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সময় পর্যটন আর স্পেশ পর্যটন দুটোই আবিস্কৃত হয়েছে।'

বাধা দিয়ে বলে টারজন, 'সময় পর্যটনই যদি জানা থাকে তো সময় পথে পেছিয়ে গিয়ে শ্যানটনের রোবট উৎপাদন বন্ধ করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায় ?'

মুচকি হাসে বোরোভিয়াক, 'ভায়া মুশকিল তো সেইখানেই। বড় বড় ঘটনাগুলো পালটানো যায় না কোনমতেই—সময় পর্যটনই বৃথা। যা ঘটবার তা ঘটবেই —ভাগ্য বলো, নিয়তি বলো—তার ওপর বিজ্ঞানের কোনো হাত নেই। রোবট উৎপাদন ভণ্ডুল করাত তাই আমাদের সাধ্যাতীত।'

কিন্তু—

'যা বলছিলাম। সমগ্র পথে পর্যটন করা নিস্ফল জেনে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছে চরমাস্ত্র—নিউ-ট্রনিক মারণ-রশ্মি। উদ্দেশ্য মহৎ—ভিনগ্রহীদের বিধ্বংসী আক্রমন থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা। তবে কি জানো, অস্ত্রটা অত্যন্ত শক্তিশালী। অপ-ব্যবহার হ'লে পৃথিবীরই সর্বনাশ ঘনিয়ে আসতে পারে। তাই লুকিয়ে রাখা হয়েছে দুর্ভেদ্য পাহাড়-সিন্দুকে। বিরাট ইলেকট্রিক তালা ঝোলে ভল্টের দরজায়। চারটে চাবী দিয়ে খুলতে হয় সেই তালা। অতীত কালের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে এই চাবী চারটে……।'

এবার বুঝতে পারে টারজন বোরোভিয়াকের অকস্মাৎ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। বলে—'বুঝলাম। চাবী চারটে আমি গিয়ে খুঁজে আনি, এই তো চান আপনি ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার নিজের লোকজনের কাউকে পাঠাচ্ছেন না কেন ?'

'সাতজনকে পাঠানো হয়েছে। ফিরে এসেছে মাত্র একজন, তাও এমন ভাঙা মন আর দেহ নিয়ে যে খুলে বলতেও পারেনি কি ঘটেছিল—কেন এমন হাল হয়েছে।' সময়-পর্যটনের জন্যে এমনটা যে হয়নি, তা বুঝেছি। তাহলে নিশ্চয় অতীতকাল থেকে চাবী উদ্ধার করা এমনই কঠিন ব্যাপার যে আমার লোকজনের সাধ্যে কুলোয়নি। অতীতের কঠোর পরিস্থিতির মোকাবিলা করে উঠতে পারেনি। এসেছি সেই কারণেই—তোমার সাহায্যের প্রত্যাশায়। শারীরিক শক্তি আর মানসিক উদারতার দিক দিয়ে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি বোধহয় শুধু তোমারই আছে। অতীতকালের অন্য যে-কোনো লোকের চোখে আমি হয়তো কুচক্রী জাদুকর ছাড়া আর কিছুই নই—'

টারজন চিন্তা-নিবিষ্ট। ঝড়ো হাওয়া হুহুংকারে বয়ে চলেছে আশপাশ দিয়ে।

ধরুন যদি সাহায্যই করলাম, তখন ? শুধোয় অবশেষে।

উৎসাহ প্রদীপ্ত মুখ, দেতো-হাসি হাসে বোরোভিয়াক। থলির মধ্যে থেকে টেনে বার করে অদ্ভুত কারুকাজ-করা একটা ধাতুনির্মিত কব্জিবন্ধ। এগিয়ে দেয় বনমানুব নৃপতির দিকে।

'হাতে পরো। যখনি কোন একটা চাবীর কাছাকাছি আসবে, তীক্ষ্ম একটা শব্দ বেরোবে এ থেকে। এ ছাড়াও তর্জমা করার ব্যবস্থাও আছে এর মধ্যে। চাবীগুলো দেখতে কি রকম, কেউই তা জানে না। তবে যে সময়কার চাবী, সেই সময়েই সেই চাবী লেগে যায়; চাবী আর এই কব্জিবন্ধ একসঙ্গে চেপে ধরলেই পরের সময় অধ্যায়ের দরজা যাবে খুলে—'

'আমি যে যাবোই, এখনো কিন্তু তা বলিনি,' বাধা দিয়ে বলে টারজন।

থমকে যায় বোরোভিয়াক। আহত মুখে কিছুক্ষণ নীরব থেকে হেসে ওঠে।

বলে—'ধরে নিলাম, তুমি যাচ্ছো। যাওয়ার পর দুটো সময়-ফটক খুলে যাবে তোমার সামনে—বাঁদিকের ফটকে ছুঁড়ে দেবে চাবীটা—সোজা চলে আসবে আমার কাছে। ডানদিকের ফটকে ঢুকবে তুমি—পৌঁছে যাবে পরের সময়-অধ্যায়ে। চতুর্থবারে ফিরে আসবে এইখানে—রওনা হওয়ার সেকেণ্ড কয়েক পরে।'

টারজনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই জের টেনে নিয়ে একটানা বলে যায় বোরোভিয়াক—'তুমিই এখন সমগ্র মানব জাতির শেষ আশা-ভরসা। কি করবে ভেবে দ্যাখো। যদি ব্যর্থ হও, দশ হাজার বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা মানব সভ্যতা ভেসে যাবে রক্তপ্লাবনে—একটা বদ্ধ উন্মাদের তৈরী চিন্তাহীন রোবট বাহিনীর বিধ্বংসী আক্রমনে। আর যদি না যেতে চাও—'

চ্যালেঞ্জ করলে টারজন অন্যমানুষ। বোরোভিয়াক যদি তার ব্যর্থ হওয়ার ইঙ্গিত কথার মধ্যে না আনতো, টারজনের বয়ে যেতো এত ঝামেলায় ঢোকার। ঝটপট নেমে যেতো পাহাড় থেকে। কিন্তু লড়াকু প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তার, শক্তি আর ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায়। আস্তে আস্তে কব্জিবন্ধ গলিয়ে নিল হাতে।

[চলবে]

বিজ্ঞান সুবাসিত গল্প

জানালার ধারে বছর পঁচিশেকের যে সুবেশ ভদ্রলোক তিনিই শুধু একা। কে জানে কোথায় যাচ্ছেন। বালেশ্বর হলে বেশ হয়, খবরাখবর নেওয়া যায়।

কন্‌ডাকটার টিকিট চেক করতে করতে ওঁর কাছে এসে দাঁড়ায়। বুঝতে পেরে ভদ্রলোক পিছপকেট থেকে ওয়ালেটটা নিয়ে টিকিট বার করে দেখান। কন্‌ডাক্‌টার এপিঠ ওপিঠ দেখে বলে, ও! আপনি বালেশ্বর পর্যন্ত! তাই ভাবছিলাম। এই সিটটা আবার বালেশ্বর থেকে রিজারভেশান আছে।

কন্‌ডাক্‌টারের পাশেই এক যাত্রী। বোধহয় প্ল্যাটফরমে সাঁটা আসন-সংরক্ষণ তালিকা দেখে অনেক জায়গা আছে ভেবে উঠে পড়েছেন। কিংবা কন্‌ডাক্‌টারই আশ্বাস দিয়ে তুলে এখন আর বসাতে পারছেনা।

বসে—থাকা ভদ্রলোক বললেন, আমাকে কি বিনা রিজারভেশনের যাত্রী ভেবেছিলেন নাকি?

কন্‌ডাক্‌টার ব্যস্ত হয়ে হাত তোলে, না না! ঠিক আছে! তারপর অপেক্ষারত যাত্রীটিকে বলে, এদিকে আসুন দেখি!

ওরা দৃষ্টির আড়ালে যেতে প্রণব বলে, গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগে খালি সিটগুলো তো ফিরি হয়। রীতিমতো দরদস্তুর চলে। জানালার ধারের ভদ্রলোক ফিরে তাকাতে বলে, আপনাকে কি এই কন্‌ডাক্‌টারই সিট দিয়েছিল নাকি?

ভদ্রলোক বলেন, ওয়েটিং লিস্টে ছিলাম। আজ আসতেই পেয়ে গেলাম। গাড়ি দিতে দেরি করল তো! লিস্ট পেয়ে বোধহয় মিলিয়ে দেখার সময় পায়নি।

প্রণব বলে, বালেশ্বর পৌঁছতে তো দুপুর দেড়টা?

ভদ্রলোক বলেন, হ্যাঁ। তোমরাও কি বালেশ্বর নাকি?

সবে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়েছে ওরা। কথা বলার লোক

খুঁজছিল। এই সুযোগে তড়িৎ বলে, নামব যদি বালেশ্বর, তবে থাকবনা ওখানে। বালেশ্বরে নেমে যাব চাঁদীপুর।

চাঁদীপুর শুনেছি খুব সুন্দর জায়গা, বলেন ভদ্রলোক। কিন্তু থাকার খুব অসুবিধে।

প্রণব তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ি আছে, বানীকুঞ্জ। সেখানেই উঠব।

গাড়ি খড়গপুরে ঢোকে। ভদ্রলোক পুরুষ্টু কলা কেনেন এক ডজন। নিজের জন্য তিনটে রেখে বাকিগুলো ওদের দিকে বাড়িয়ে দেন।

গাড়ি ছাড়তে পরিচয়টা আরো ঘনিষ্ঠ হয়। ভদ্রলোক সুদর্শন রায়। কলকাতায় বড় চাকরি করেন। থাকতে থাকতে যখন হাঁফিয়ে ওঠেন তখন এমনি বেরিয়ে পড়েন হঠাৎ। চাঁদীপুর তো হলোনা। তাই ভেবেছেন বালেশ্বরে নেমে ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে মহাবীরের মন্দিরের কাছে কাটাবেন ক'টা দিন। তবে ফেরার আগে চাঁদীপুরটা একবার দেখে আসবেন। ওদের কথা শুনে বললেন, লোভ হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে জুটে যেতে।

ওরা তিনজনেই সমস্বরে বলে ওঠে, চলুন না দাদা! চলুন না! একা একা আমাদেরই কি ভাল লাগবে!

ফিক করে হেসে ফেললেন সুদর্শন। বললেন, তিনজনে একা একা।

প্রণব বলে, না, মানে বাড়ি থেকে একা বেরোন তো এই প্রথম।

সুদর্শন জমাটি আড্ডাবাজ। কোথা দিয়ে সময় যে কেটে যায় টেরই পায় না ওরা।

গাড়ি জলেশ্বরে ঢোকে। মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে শুরু করে। সুদর্শন বলেন পরের ষ্টেশনই বালেশ্বর।

তড়িৎ বলে, তাহলে দাদা! যাচ্ছেন তো আমাদের সঙ্গে?

প্রণব বলে, বা! সেই কথাই তো হলো!

সুদর্শন বলেন, তার চেয়ে এক কাজ করনা! তোমরাও চল আমার সঙ্গে। পাহাড়ে দিন তিনেক কাটিয়ে একসঙ্গে চাঁদীপুরে যাব। ওখানে গুহা আছে। বৌদ্ধযুগের শিলালিপিও নাকি আছে। তোমাদেরও দেখা হবে, আর আমারও চাঁদীপুর।

সুমিত বলে, আইডিয়াটা ভালোই। কিন্তু যেখানে উঠবেন সেখানে তো আর জানেনা যে পথের মধ্যে আপনার এতগুলো সাঙ্গপাঙ্গ জুটে গেছে!

হাহা করে হেসে ওঠেন সুদর্শন। আরে! আমি কি কোন জায়গা ঠিক করে যাচ্ছি নাকি! শুনেছি গিয়ে পড়লে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত হয়ে যায়। তা, আমার যদি হয় তো তোমাদেরই বা হবেনা কেন?

ওদের তিনজনের মুখোমুখি-বসা ভদ্রলোক হাওড়ায় কুলির সঙ্গে প্রচুর হসন্ত আর ড-য় শূন্যওলা শব্দ জুড়ে বচসা করেছিলেন। ওরা ভেবেছিল ওড়িয়া। পরে গাড়ি ছাড়তে গুছিয়ে বসে সদ্য-প্রকাশিত আনন্দ মেলা বার করে মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। তারপর কখন হাঁ করে নাক ডাকাতে শুরু করেছেন খেয়াল করেনি ওরা। এখন দেখা গেল উনি এক ডোজ দিবানিদ্রা সেরে ওদের কথাবার্তা বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনছেন।

সুদর্শন থামতেই ভদ্রলোক বললেন, পাহাড়ের উপরি গোটিএ ঘরঅ অঁছি, আপনঅ যাও নাহান্তি! সেঠি আপনঅ ভালঅ রহিবে। ভাড়া বি কম! সেঠির পাশে মালিকঅ রহন্তি। পাণিগ্রাহি।

হতভম্ব তিনজনেই এক সঙ্গে বলে উঠল, সে কি! আপনি বাঙ্গালী নন?

ভদ্রলোক বোধহয় ওঁর কোলের ওপর পড়ে থাকা পত্রিকাটার কথা ভুলে গেছেন। বেশ গরম হয়ে বললেন, বঙ্গালী কাঁই! মুই ওড়িয়া অছি। তারপর যেন ভুবনেশ্বরে নেমেই ওড়িষ্যার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন এমন একটা মুখের ভাব নিয়ে পড়তে লাগলেন কোলের উপর পড়ে থাকা পত্রিকাটি।

তড়িৎ ফিসফিস করে বলল, এমন অনেক মজার মজার ব্যাপার ঘটে ট্রেনে, কিন্তু আর কি মজার ব্যাপার তা আর বলার সুযোগ হলোনা। গাড়ি বালেশ্বর ঢুকল।

বালেশ্বর শহরটা ষ্টেশনের বাঁদিকে। ওভারব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে ওরা যে জায়গাটায় এসে হাজির হলো সে জায়গাটায় পুরো শহরতলির ছাপ। খাপড়ার চালা, গোবর, খোলা নর্দমা কি নেই! তবে তারই মাঝে অটোরিক্সাও আছে একটা। গাছপাল ছাড়িয়ে শরতের নীল আকাশের নীচে ধূসর পাহাড়ের শ্রেণীটা দেখা যাচ্ছে। তবে সেটা কতদূরে ঠাহর করতে পারলনা ওরা। সুদর্শন হাতের চেটোর আড়ালে দৃষ্টি মেলে বললেন, আরে! এ যে দেখছি বহুদূর! আট দশ কিলোমিটার তো বটেই! অটো ছাড়া তো হবেনা।

অটোরিক্সার চালক অবশ্য একটা খুপরি চায়ের দোকান

[এরপর ৩৯ পৃষ্ঠায়]

থেকে ওদের ওভারব্রিজ দিয়ে নামতে দেখেছিল। এবার হেলে দুলে তার গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল।

গরজ ওদের। সুদর্শন বললেন, কি! যাবে নাকি ভাই?

লোকটা এবার ভ্রু কুঁচকে ওদের দেখল। প্রশ্নটা বোধগম্য হলো কিনা বোঝা গেল না। তারপর বলল, কুয়াড়ে?

সুদর্শন বললেন, মহাবীরের মন্দির।

লোকটা এবার চালকের আসনে বসে বলল, অষ্ট টঙ্কা। আর বলেই প্যাডেল মেরে স্টার্ট দিয়ে দিল।

দরদস্তুর করার সুযোগ নেই কোনো। না উঠে পড়লে সবেধন নীলমণি অটোরিক্সাটাও ফস্কে যায় বুঝি। তাই ওরা হুড়মুড় করে উঠে পড়ল।

মিনিট পার হবার আগেই শেষ খোলার ঘর ছাড়িয়ে ওরা একেবারে খোলা বনের মধ্যে। খাড়া খাড়া শালগাছের ফাঁক দিয়ে বেলেমাটির ওপর কালো পিচবাঁধানো পথ। তাই দিয়ে তরতর করে এগোতে এগোতে সামনের পাহাড়টা ক্রমে বড় হয়ে ওঠে। পাহাড়ের খোঁজগুলো স্পষ্ট হতে হতে এক সময় সোজা সোজা গাছের গুঁড়িগুলো সব সরু প্যাঁকাটির মতো দেখতে লাগে। আর বাড়ি ঘরদোর খেলার বাড়ির মতো হলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আরো গোটা দুই বাঁক ঘুরে এক সময় অটোচালক বলল, মহাবীর মন্দির আ গয়া। বলে অটোরিক্সাটা পরিপাটি করে ঘুরিয়ে একটা বাঁধানো বটতলায় এনে দাঁড় করলে ও।

বটতলা ঘিরে ক'টা ভাজাভুজি, মিষ্টি আর পানের দোকান। তিনচারটে রিক্সা আর সাইকেল। মহাবীরের মন্দির ঘিরে যে ছোট্ট গ্রাম, বোঝা যায় বটতলাটাই তার এসপ্ল্যানেড।

চালকের হাতে অষ্ট টঙ্কা গুণে দিয়ে সুদর্শন বললেন, কি যেন নাম বললেন ভদ্রলোক?

প্রণব বলে, পাণিগ্রাহী।

পানের দোকানে খোঁজ করতেই ওরা দেখিয়ে দিল। মন্দিরের পথে এগোতে বাইরে দরজায় লেখা, এন সি পাণিগ্রাহী।

কড়া নাড়তেই পাণিগ্রাহী নিজেই বেরোলেন। থাকার জায়গার কথা জিজ্ঞেস করতেই পরিষ্কার ইংরাজিতে স্বাগত জানালেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাড়িভাড়া ঠিক হলো। তারপর একটা ছেলে চাবি নিয়ে এসে ওদের ডাকল।

বাড়িটা পাহাড়ের গায়ে। পিল্লর বেশ ক'ধাপ ওপরে। সদর দরজার তালা খুলে ও একটা ঘর খুলে দিল। নেয়ারের চারটে খাটিয়া। ওপরে চাদর বিছিয়ে নিলেই বিছানা হয়ে গেল। একটা টেবিল, দুটো করে চেয়ার আর মোড়া। কুলুঙ্গিতে পরিষ্কার কাঁচের গ্লাস আর জগ। বাড়ির মধ্যেই টিউবওয়েল। যাবার সময় বটতলার একটা দোকানে যে বলে রাখলে খাবার পাওয়া যাবে সে কথাও জানিয়ে দিয়ে গেল ছেলেটা।

প্রণব বলে, ঠিক যেন আমাদের মতো দুদিনের অতিথির জন্য তৈরি।

সুদর্শন বলেন, এখানে জানুয়ারি না কোন সময় একটা মেলা হয়। অনেক দূরদূরান্তের থেকে লোক আসে। শুনেছি যে ক'টা বাড়ি এখানে সবই ও সময় ভাড়া হয়ে যায়। চল! এবার নীচে গিয়ে চা-টা খেয়ে ঘুরে ফিরে দেখা যাক। একটু পরেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে।

ওরা বারান্দায় বেরোয়। উঁচু থেকে অনেকদূর চোখ যায়। ঠিক যেমন মনে হয়েছিল গ্রামটা তত ছোট নয়। বহুদূর পর্যন্ত ছোট ছোট বাড়ি ছড়িয়ে। তবে সবই নীচে। পাহাড়ের ওপর এই একটাই। সুজিত বলে, এই বাড়িটা দলছুট হলো কেন বলুন তো!

নীচে নেমে ওরা রাতের খাবারের বরাত দিয়ে বটতলা থেকে বেরোয়। একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে পাশাপাশি দুটো গুহা। খণ্ডগিরি উদয়গিরির মতো। বটতলা ছেড়ে ওরা সে দিকে এগোয়। একটা লোক এগিয়ে এসে যেচে আলাপ করে। কথাবার্তায় বেশ যো-হুজুর ভাব।

বলে, আপনঅ মানে সেই ঘরে গলে কি? আপনঅ মানে জানিছন্তি সেটি ভূতোকুঠি? সেঠি ভূতো মানে রহন্তি। অধিকঅ রাতিরে আপন মানে শুনুথিবে চারিধারে দুমদাম ধুপধাপ শব্দ হউছি। সারারাতি সেই শব্দ চালু থিব। কেত লোকঅ সস্তা হেব বলিকিরি রাতি কাটাইবা পাঁই সেঠি যাইছন্তি। কিন্তু রাতি মাঝারে ডর পাই পলাইছন্তি। কেতে বরষ হেলা ন ঘরটি খালি পড়িছি। ভাড়া পাঁই কেহি আসু নাহান্তি। বলে মুচকে হেসে নমস্কার করে চলে যায়।

প্রণব বিড়বিড় করে, ও দাদা! নামতে না নামতেই যে ভূতের ভয় দেখায়!

সুদর্শন বলেন, তাহলে তো জমবে ভালো। শুধু বেড়ান নয়, অ্যাডভেঞ্চারও হবে। দেখ, হয়তো পাণিগ্রাহীর

ওপর স্থানীয় মোষের রাগ আছে। তাই ভুজুংভাজুং দিয়ে ভাড়াটে ভাগায়।

গুহায় পেঁছিতে মিনিট কুড়ি যায়। বড় বড় গুহা। লোকজন যে মাঝে মাঝে থাকে তার চিহ্ন সর্বত্র। তবে ভূতের গল্প শোনার পর থেকে মিইয়ে যায়।

সন্ধ্যায় একটু পরেই খাবার দিয়ে যায়, ওরাও তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে রাত ন'টা নাগাদ শুয়ে পড়ে।

সুদর্শন বলেন, নাঃ! একলা এলে হাঁফিয়ে উঠতে হতো। কালকের দিনটা না হয় ঘুয়ে ঘেরে কেটে যেত! কিন্তু পরশু?

একটু আগেও পল্লির কোলাহল শোনো যাচ্ছিল। সাড়ে ন'টা নাগাদ তাও মিলিয়ে গেল। অখণ্ড নিঃস্তব্ধতার মধ্যে শুধু ঝিঁ ঝিঁর একটানা শব্দ। সুমিত দুচারটে কথা বলে। সুদর্শন জবাব দেন। একটু বাদেই ওদের চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

অনেক রাতে পর পর ক'টা বুম বুম শব্দে চমকে জেগে উঠে বসে পড়ে সুমিত। ওপাশের খাটিয়া থেকে সুদর্শন বলেন, ব্যাপারটা কি বলতো।

ও! জেগে গেছেন? সুমিত বলে। বলতে বলতেই আবার ক'সেকেণ্ড ফুট ফাট দুম ধড়াম দাম্। সুদর্শন উঠে বসেন। সুমিত আর তড়িৎ একেবারে লাফিয়ে ওঠে।

ঘুমোয় কার সাধ্য! বলে তড়িৎ।

চল! বেরিয়ে দেখি। বলে সুদর্শন নিজেই নেমে দরজার হুড়কো খোলেন।

অন্ধকার রাত। দূরে বালেশ্বরের আলো মিটমিট করে জ্বলছে। মিনিট ক'য় পরপরই শব্দ। অনেকটা দেওয়ালির রাতের মতো। ওদিক থেকেই আসছে। তবে পল্লির আর কেউ ওদের মতো জেগে উঠেছে বলে মনে হলো না। মাঝে মাঝে এক একটা শব্দের দমকে চমকে চমকে উঠতে হচ্ছে।

বহু চেষ্টা করেও শব্দরহস্যের যখন কোনো কিনারা হলোনা, সুদর্শন একটা বড় মোড়া বার করে বললেন, তোমরাও এক একটা টেনে বসে যাও।

ঘুমকাতরে প্রণব বলে, সে কি দাদা! বসে বসেই কাটিয়ে দেবেন নাকি রাতটা?

উপায় কি? বলেন সুদর্শন, একটু করে ঘুম আসবে আর চমকে চমকে উঠতে হবে, তার থেকে এই ভালো। ঘুমোবার যদি চেষ্টাই না করি তবে আর চমকাবার কথা ওঠেনা।

বলতে না বলতেই কানের কাছে এমন একটা বোমা ফাটলো যে চারজনেরই এক সঙ্গে চমকে উঠল।

তড়িৎ টর্চ জ্বেলে বলে, রাত মোটে একটা। এ ভাবে বসে কাটানো যায় নাকি!

সত্যিই তা গেলনা। ক্ষেপে ক্ষেপে চমকে ওঠার মধ্যে ওরা কখন বসে বসেই ঝিমোতে শুরু করেছে। হঠাৎ সুদর্শনের ডাকে প্রণব, তড়িৎ আর সুমিত একসঙ্গে আবিষ্কার করল ওরা দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুদর্শন বলেন, শব্দটা বোধহয় কমেছে। চল! বাকি রাতটা ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।

ওদের ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেশ বেলা। সুদর্শন বললেন, কিন্তু দোকানের ছেলেটা তো কই চা দিয়ে গেলনা।

মুখ হাত ধুয়ে বটতলায় আসতে জানা গেল যে ছেলেটা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বেশ ক'বার ডাকাডাকি করে চলে গেছে।

প্রাতরাশ সেরে ওরা রাতের শব্দটার বিষয়ে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু জানা গেলনা বিশেষ কিছু। আগের দিন গুহায় খাবার পথে যে লোকটা পাণিগ্রাহীর বাড়িটাকে বলেছিল ভূতোকুঠি, তাকেও পাওয়া গেল না।

সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরতে মন্দ লাগল না। বনের মধ্যে গাছপালার শনশন শব্দ। রাতের শব্দের কোনো হদিশ নেই। সন্ধ্যায় খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দায় মোড়া টেনে বসে তড়িৎ বলে, সারাদিনে আর শব্দটা শুনেছেন দাদা?

সুদর্শন মাথা নাড়েন। সুমিত আর প্রণব বলে, আশ্চর্য তো! সেই সকালে একবার মনে হয়েছিল, তারপর আর সারাদিনে মনেই পড়েনি।

ওরা চুপচাপ কান করে শোনার চেষ্টা করে। কানে আসে শুধু ঝিঁঝির ডাক। শেষে বিরক্ত হয়ে বলে সুমিত, না! আজ আর বোধহয় শোনা যাবে না। কাল নিশ্চয়ই কোথাও বিয়ে টিয়ে ছিল। বাজিটাজি ফুটেছে।

হাসতে হাসতে সুদর্শন বলেন, আরে! আশ্বিন মাসে হিন্দুর বিয়ে হয় না।

কিন্তু মাঝরাতে প্রণবের নিকট আর্তনাদে হঠাৎ সুদর্শনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। হুড়মুড় করে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎও। অকাতরে ঘুমোচ্ছিল সবাই। প্রণব কোন স্বপ্নটপ্ন দেখে থাকবে। তার মাঝে আচমকা বিস্ফোরণের শব্দে জেগে উঠে বাস্তব আর স্বপ্নে গুলিয়ে ফেলে অমন চীৎকার করে ওঠে।

আগের রাতের মতোই শব্দ চলতে থাকে। কখনো আস্তে, কখনো তীব্র কানে তালা লাগান। সে রাতেও বসে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে এক সময় পিঠে শুয়ে পড়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় ওরা। সকালে ঘুম ভেঙ্গে তড়িৎ বলে, ভূতোকুঠিই বটে! না দাদা, আর নয়। খুব শিক্ষা হলো যাহোক। চলুন! পাণিগ্রাহীকে চাবি ফেরৎ দিয়ে চাঁদীপুরে যাওয়া যাক।.

পাণিগ্রাহীকে চাবি দিতে যেতে ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধে হয়নি। একদিন আগেই ছেড়ে দিচ্ছেন, তাই বলছিলাম। তড়িৎ ক্ষেপে গিয়ে বলে, অসুবিধে হয়নি মানে! আপনার কুঠি ভূতোকুঠি জানলে কেউ ভাড়া নেয়! অচেনা জায়গা, নইলে দেওয়া ভাড়া আদায় করে নিতাম। সুদর্শন সামলাতে চেষ্টা করে বলেন, এই তড়িৎ! থাক থাক! সরাসরি আক্রমণে অপ্রতিভ পাণিগ্রাহী বলেন, শব্দটার কথা বলছেন? ও তো চাঁদীপুরের শব্দ। এ! বড় ভুল হয়ে গেছে। আগে থেকে বলে দিলেই হতো!

তড়িৎ বলে, থাক! খুব হয়েছে। এবার চলুন দাদা!

সারা রাস্তা গজগজ করে তড়িৎ। চাঁদীপুরের শব্দ। আর দাদা। আপনিও মেনে নিলেন কথাটা? কেননা দশ পনের কিলোমিটার দূরত্ব চাঁদীপুরের।

বাণীকুঞ্জ বড় রাস্তার উপরেই। অটোরিকসার ভাড়া মিটিয়ে তদারককারীর কাছে মালিকের পরিচয়পত্র পেশ করার আগেই আপাদমস্তক কেঁপে উঠল ওরা গত দুরাতের বিভীষিকা রহস্যময় বিস্ফোরণের শব্দে। পনের মিনিট পরপর বিস্ফোরণের শব্দের সময়টুকু ধরতাই হিসাবে চলল কালীপটকার মতো ফুটপাট। তদারককারীকে জিজ্ঞেস করতে বলল, ও কিছু নয়! সরকারি গোলাবারুদ পরীক্ষা। সুদর্শন বললেন, যাকে বলে 'রুটিন ষ্টেস্টিঙ।

প্রণব বলে, হা ভগবান! এই ব্যাপার! কিন্তু এতো বিকেল না গড়াতেই কান ঝালাপালা। তা পাণিগ্রাহীর ওখানে রাত দুপুরের ঘন্টা তিনেক মাত্র শব্দ পেতাম কেন?

রুটিন টেস্টিঙ শুনেই তড়িৎ বসে পড়েছিল। সামনের জলভরা দুকোণা ফুলদানিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে উঠল, ভগবান নয়! সায়েন্স্। টোটাল ইনটারনাল রিফ্লেকশান।

প্রণব ঝেঁকে ওঠে, তবে রে সায়েনটিস্ট। সারাটা পথ যে পাণিগ্রাহীর শ্রাদ্ধ করতে করতে এলি? তা এই টোটাল রিফ্লেকশান না কি বললি, সেটা কোন জানোয়ার?

তড়িৎ ফুলদানিটার পেছনে হাত দিয়ে বলে, আমার হাতটা দেখতে পাচ্ছিস?

প্রণব আর সুমিত তাকায়। না হাত কই। যেন আয়নার মত, ওদেরই প্রতিবিম্ব। প্রণব যাচাই করার জন্য ঘুরে তড়িতের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। আয়না-টায়না নয়, স্রেফ স্বচ্ছ কাঁচ। তড়িৎ ছবি এঁকে তত্ত্বটা বোঝাতে বসে।

সুদর্শন বলেন, এবার মনে পড়ছে বটে। পরীক্ষার আগে যখন রাত জেগে পড়াশোনা করতাম তখন কলেজ স্ট্রীট পাড়ার আমার টঙের ঘর থেকে গির্জার ঘন্টা শুনতে পেতাম। জান কোথাকার শব্দ? ধরমতলার মোড়ের গির্জার। এই টোটাল ইনটারনাল রিফ্লেকশান। দিনের বেলা মাটি তেতে ওঠে, নীচের বায়ুমণ্ডল হালকা হয়ে যায়। কিন্তু সন্ধ্যার পর বায়ুমণ্ডল ঠাণ্ডা হতে হতে মাঝরাতে যখন খুব ভারি হয়ে ওঠে তখনি ঘটে এই কাণ্ডটা। তবে সব জায়গায় যেমন ফুলদানির পেছনটা আয়নার মতো দেখায় না ঠিক তেমনি সব জায়গা থেকে প্রতিফলিত শব্দ শুনতে পাওয়া যায় না। গাঁয়ের লোক বোধহয় শব্দের আওতার বাইরে। পাহাড়ের ওপর বাড়ি বানিয়ে পাণিগ্রাহী বোধহয় শব্দের ঠেলায় নীচে নেমে এসেছে। আর ওর দেখাদেখি আর কেউ পাহাড়ের ওপর ঘর বানিয়ে বেকুব হয়নি।

সুমিত বলে, ঠিকই বলেছিলেন দাদা! বেড়ানই নয় শুধু, ছোট একটু এ্যাডভেঞ্চারও হলো।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার কথা

বিচিত্র চিঠি

গীতা গঙ্গোপাধ্যায়

চিঠি পেতে এবং লিখতে অনেকেরই ভালো লাগে। আমি খুব ভালোবাসি। অবশ্য আমি এমন মানুষকেও জানি চিঠি লিখতে তার যত আলসেমি, এমন মানুষও আছে। কিন্তু যাই বল চিঠি বা ডাকের ব্যবস্থা আমাদের কাজকর্মকে অনেক সহজ করে তুলেছে। খুব জরুরী না হলেও গরমের ছুটিতে যখন তোমার মনে হবে বন্ধুকে একটা চিঠি লিখি বা তুমি বেড়াতে গিয়েছ কোনও পাহাড়ে। আর পাহাড়ের সেই দৃশ্যের কথা বন্ধুকেই যদি জানানো যায় তাহলে সব বৃথা। কিছুটা সত্যি, কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে বাহাদুরী কেনা পেতে চায় বল ?

আজকাল কোথাও থেকে চিঠি পাঠানো আর কোনো সমস্যাই নয়। যতই অজ পাড়াগাঁ হোক না কেন ডাক বিলির ব্যবস্থা ঠিকই আছে। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন কতকগুলো মুহূর্ত আসে বা মানুষকে কখনও কখনও এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় যখন চিঠি লেখা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সেটা যে জায়গার জন্য হয় তা নয়, পরিস্থিতির জন্য। ধর যুদ্ধক্ষেত্র, মরুভূমি বা ডুবন্ত অবস্থায় তোমরা বলতে পারো, এই রকম অবস্থায় চিঠি লিখবে কি করে? কাগজ, কলম এসব পাবে কোথায়? প্রশ্নটাতো সেখানেই। সে রকম পরিস্থিতিতে পড়লে মানুষ কেমন করে চিঠি লেখে তেমন কয়েকটি নমুনা আজ তোমাদের দেব।

তোমরা জানো চিঠি সংবাদ বয়ে আনে তা দুঃখের হতে পারে আবার সুখেরও। এই ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষ যখন চিঠি লেখে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুঃখের হয়ে থাকে, সুখেই যদি থাকে তবে আর ঐ অবস্থায় মানুষ পড়ে কি করে! কিন্তু তারই মাঝে এরকম চিঠি কখনও কখনও আনন্দও বয়ে আনে।

যাইহোক সেই সুখ দুঃখের কথাই বলছি।

প্রায় একশো বছর আগের কথা। ইংলণ্ড থেকে 'কালেরু' নামে একটা জাহাজ চলেছে উত্তরে। পৃথিবীর মানচিত্রটা বের করে দেখ ইংলণ্ডের উত্তর মানে বরফের দেশ। জাহাজ বরফের চাঁই কেটে কেটে পথ করে নিয়ে এগোতে থাকে। কিন্তু দুর্ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটে। বরফের চাপে পড়ে অনেক সময় জাহাজ তলিয়ে যায়। আজ-কাল অনেক আধুনিক যন্ত্র বের হয়েছে বরফ গলিয়ে আগেই পথ করে নেয় অথবা বরফ গলা পর্যন্ত অপেক্ষা

করে। কিন্তু 'কালেরু'র ভাগ্যে ছিল চিরদিনের মতন হারিয়ে যাওয়া, তাই হারিয়ে গেল। 'কালেরু' আর ফিরলো না। কোনও চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না জাহাজটার। এই ঘটনার দেড় বছর পরে ঘটনাচক্রে সমুদ্রের ধারে কুড়িয়ে পাওয়া গেল একটা কাঠের টুকরো। একটা ছোট কাঠের টুকরো কেমন করে মানুষকে আকর্ষন করেছিল জানি না—একেই বলে ভাগ্য। তা নইলে 'কালেরু' জাহাজের এক খালাসী যুবক, নাম যার 'ডসন' তার কোনো কথাই আমাদের জানা হোতো না।

ডসনের বৃদ্ধা মা থাকতেন ইংলণ্ডে। ডসন 'কালেরু' জাহাজে খালাসীর কাজ করতো। দিনের পর দিন যায়, বুড়ী-মা ছেলের কোনো খবর পান না। 'কালেরু' ডুবে গেছে সে খবরও বিশ্বাস করতে চান না। কিন্তু দেড় বছর পর সেই কাঠের টুকরোটি তাঁকে জানিয়ে দিল সেই নির্মম সত্য কথাটি। ডসন ভীষণ ভালোবাসত তার মাকে মৃত্যু যখন সামনে তখনও ডসন শুধু মায়ের কথাই ভাবছে, মা যে তাকে কত ভালবাসেন, মা যে কত কষ্ট পাবেন, সে তো তা জানে। তাই একটা কাঠের টুকরোর ওপর আলকাতরা দিয়ে লিখে জলে ভাসিয়ে দিল। আশা—কোনোদিন যদি মার হাতে পড়ে, মা তো জানতে পারবেন তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে সে লিখলো, 'কালেরু' অন্য জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাচ্ছে। আর সময় নেই। ঈশ্বর মাকে শান্তি দাও। ডসন।' বৃদ্ধার হাতে যখন কাঠটি এসে পৌঁছালো। তোমরা বুঝতেই পারছো সেদিন মায়ের মনের অবস্থা কি ছিল। যতদিন মা বেঁচে ছিলেন ততদিন ছেলের এই স্মৃতিটুকুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন।

দৈবাৎ ভেসে আসা কাঠের টুকরো পৌঁছেছিল ঠিক কথা। কিন্তু নাও পৌঁছতে পারতো। এবার যে চিঠির কথা বলছি, তোমাদের খুব মজা লাগবে। চিঠি কিন্তু ডাকঘর থেকেই বিলি হয়েছিল। হার্বার্ট নামে একটি যুবক যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধে লড়াই করে তার দিন বেশ ভালোই কাটতো। কিন্তু বড়দিন এসে গেছে, তখন বাড়ির জন্য মন কেমন করতে লাগলো। পুজো এসে গেলে তোমাদের কি আর ভালো লাগবে বাড়ি থেকে দূরে থাকতে? ভেবোনা তোমরা ছোট বলেই এমন হয়, মোটেও না। ছোট বড় সকলের মনের মধ্যেই এই সময় বাড়ির জন্য, মা, বাবা, ভাইবোন সকলের জন্য মন কেমন করে। হার্বার্টেরও মন খুব খারাপ, শুধু বাড়ির কথা মনে হচ্ছে। অথচ কাছে কাগজ কলম এমন কিছু নেই যে একটা চিঠি লিখে ওর মনের কথা জানাবে। একদিন মরিয়া হয়ে একটা বিস্কুটের মধ্যে পেন্সিল দিয়ে বাবার কাছে চিঠি লিখতে বসে গেল। একটা জিনিস জানবে তুমি, টিকিট লাগাও আর না লাগাও যদি ঠিকানা ঠিক মতন লিখতে পারো তবে তোমার লেখা ঠিক জিনিস জায়গা মতো পৌঁছে যাবে। শুধু যিনি তোমার চিঠি বা জিনিস পাবেন তাঁকে ডাক খরচ দিয়ে, সেটা নিতে হবে, অবশ্য কিছু বেশি। তবে হার্বার্টের বাবার কত ডাক খরচা দিতে হয়েছিল বা আদৌ দিতে হয়েছিল কিনা আমি জানিনা, তবে বিস্কুটটা তিনি পেয়েছিলেন। তা বলে ভেবোনা বিস্কুটটা খেয়ে ফেলেছিল কেউ—না, সযত্নে বিস্কুটা ঢিবিটা রেখে দিয়েছিলেন হার্বার্টের বাবা।

অনেকদিন আগে ইংলণ্ডের সঙ্গে আফ্রিকার বুঅরদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া আছে। বুঅরদের সঙ্গে যুদ্ধে সেবারে ইংরাজের পরাজয় হয়। অনেক ইংরাজ সৈন্য এই যুদ্ধে বন্দী হয়। তোমরা নিশ্চয় জানো সাধারণতঃ সৈন্যদের বয়স খুব বেশি হয় না। বিশেষ করে যুবক যারা তারাই দলে দলে যুদ্ধে যোগ দেয়। যুদ্ধে জয়ী হয়ে বুঅররা বন্দীদের ওপর খুব অত্যাচার করে। বন্দীদের মধ্যে টম নামে একটি ছেলে ছিল। বন্দী অবস্থায় সে শুধু বাড়ির কথা ভাবতো। তার মা যে কি মনো কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন তাই ভেবেই সে অস্থির হয়ে উঠতো। বেশ কিছুদিন বন্দী থাকার পর হঠাৎ একদিন তারা খালাস পেলো। খালাস পেয়ে টম আনন্দে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। প্রথমেই তার মনে পড়লো কেমন করে মাকে জানাবে যে সে ভালো আছে। কেননা তাদের বন্দী হওয়ার কথা তো সবাই জানে আর মুক্তি পাবার কথা জানলে পর মা কতই না খুশী হবেন। সশরীরে মায়ের কাছে গিয়ে হাজির হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। একটা চিঠি লিখেই যে জানাবে তারও উপায় নেই। কোথায় পাবে কালি কলম পয়সা কাগজ। টমের খুব বুদ্ধি ছিল। সে চট করে পায়ের ছেঁড়া জুতোটা খুলে তার নীচে থেকে একটা লম্বা চামড়া খুলে নিল—একেবারে জুতোর তলায় যেটা থাকে। তারপর লোহার শিক দিয়ে খুব জোরে জোরে যাতে দাগ বসে এ ভাবে চিঠি লিখলো। চিঠি লেখা হলে তার ওপর কয়লার কালি ঘষে দিল। লেখাটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সুন্দর করে ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিল। তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা তবে টমের মা যে চিঠি পেয়েছিলেন আর চিঠি পেয়ে যে তাঁর কি আনন্দ হয়েছিল তা নিশ্চয় বুঝতে পারছো? ভগবানকে দু-হাত তুলে ধন্যবাদ জানালেন যাক ছেলে বেঁচে আছে, ভালোই আছে।

দুর্ঘটনায়
বিস্ময়কর আবিষ্কার

অশোক রায়

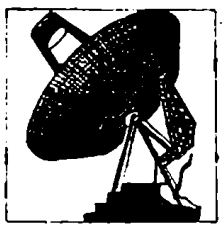

প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী সি এফ সনবেইন অ্যাসিড নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরিক্ষা করছিলেন ১৮৪৫ সালে। উনি বেশির ভাগ কাজ বাড়িতেই করতেন! এর জন্য ওর স্ত্রী খুব রেগে যেতেন। কারণ যখন তখন উনি রান্নাঘরে ঢুকে এক্সপেরিমেন্ট করতেন! যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে এই ভয়ে ওঁর স্ত্রী ওকে একেবারেই রান্নাঘরের ধারে কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। রান্নাঘরে ঢোকা ছিল বারণ। দুর্গন্ধ- যুক্ত অ্যাসিড সহ্য করতে পারতেন না ওর স্ত্রী। তবুও উনি সুযোগ খুঁজতেন। ওঁর স্ত্রী দোকানপাটে গেলেই রান্নাঘরে ঢুকে পড়তেন।

একদিন যখন তঁর স্ত্রী বাজারে বেরুলেন সেই সুযোগে ঢুকলেন তিনি হেঁসেলে। ভয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে স্ত্রীর অ্যাপ্রনে কিছুটা দ্রবন চলকে পড়ে গেল। হায়! এখন তিনি কি করবেন। স্ত্রী টের পেলে রক্ষে নেই। স্ত্রী আসার আগে এবং ধরা পড়ার আগে ষ্টোভের ওপর অ্যাপ্রনটা শুকোতে লাগলেন! শুকিয়ে গেল ঠিকই। কিন্তু অ্যাপ্রনটাই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সনবেইনের কাছে বিজ্ঞানের এক নতুন সোপান উন্মোচিত হল। অ্যাপ্রনের সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রনের বিক্রিয়া ঘটে একটা নতুন বিস্ফোরক তৈরী হয়েছে যার নাম নাইট্রো-সেলুলোজ। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হোত তখন গান পাউডার। এরপর থেকে গান পাউডারের পরিবর্তে নাইট্রো-সেলুলোজের ব্যবহার এল!

*　　*　　*

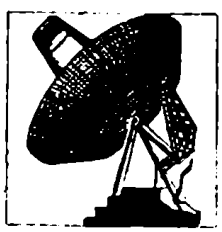

সুইডেনের প্রখ্যাত রসায়নবিদ অ্যালবার্ট হফম্যানের নাম কে না শুনেছে। কিন্তু তিনি কি জন্য বিখ্যাত—কেমন করে সেই অসাধারণ জিনিসটি আবিষ্কার করলেন তা অনেকের কাছেই অজানা। ১৯৩৩ সাল। তিনি তাঁর পরীক্ষাগারে বসে কাজ করছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রমে মুখ দিয়ে ঘাম ঝড়াছিল। মুখের ঘাম হাত দিয়ে মুছবার সময় ঠোঁটে চলে যায় কিছুটা ক্রিস্ট্যাল। রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়লেন সেই ক্রিস্ট্যাল মুখের মধ্যে চলে যায় তখন। তারপর! তারপর সারারাত ধরে তিনি দেখলেন বিচিত্র স্বপ্ন, অদ্ভুদ অযৌক্তিক—রঙিন সব স্বপ্ন যা ছিল তার কল্পনাতীত। দুর্ঘটনায় আবিষ্কৃত ঐ ক্রিস্ট্যাল আর কিছু নয়—এল, এস ডি।

গ্রহ চারশো বিশ

হারুন অর রসিদ

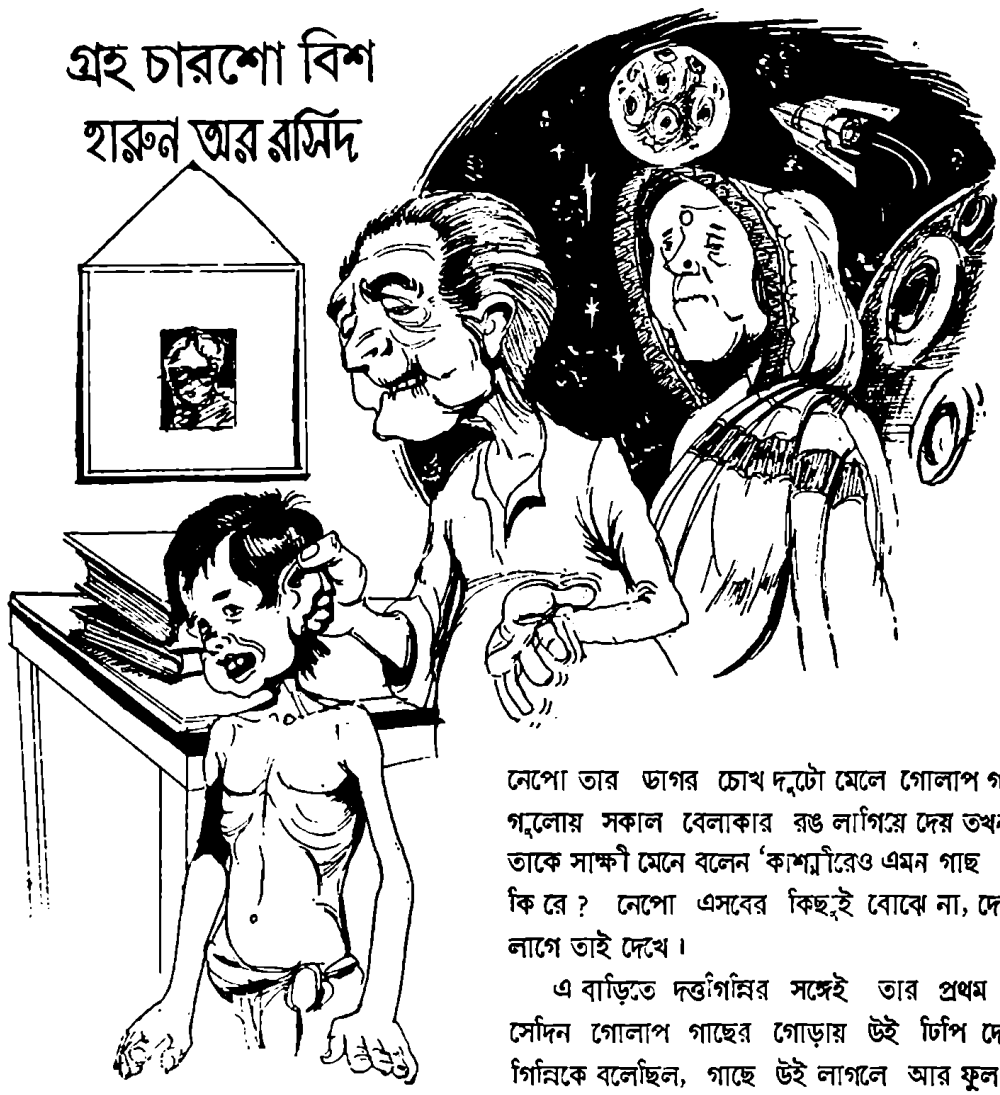

দত্তবাবুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে, এমন জোর নেই নেপোর গায়ে। কংকাল শরীরটায় একটা চামড়ার আচ্ছাদন নিয়ে সেই যে জন্মে ছিল, বারোটা বছরে তার আর কোনো পরিবর্তন হলো না। দত্তগিন্নির তাই ভীষণ মায়া এই নেপোর জন্যে।

নেপোর বাবা ছিল ঘোষালদের মালী, সেখানে কত রকমের গাছ, সারা বছর ফুলে ফুলে ভরা। নেপোর রাত্রি দিনের খেলা চলতো সেখানে—ফুল আর গাছের সঙ্গে। সেখানেই নেপো তার বাবার কাছে শিখেছিল কত রকমের ফুল আর তার রঙের নাম।

গত বছর নিমোনিয়ায় তার বাবা মারা গেলে পর ঘোষালরা আর নেপোকে তাদের বাগানে ঢুকতে দেয় না, তাই দত্তবাড়ির এই এক টুকরো বাগানের প্রতিই তার লোভ। দত্তবাবুর হাতে তৈরি এই ছোট্ট বাগানটার পাশে এসে, যখন নেপো তার ডাগর চোখ দুটো মেলে গোলাপ গাছের পাতা গুলোয় সকাল বেলাকার রঙ লাগিয়ে দেয় তখন দত্তবাবুই তাকে সাক্ষী মেনে বলেন 'কাশ্মীরেও এমন গাছ জন্মায় না, কি রে? নেপো এসবের কিছুই বোঝে না, দেখতে ভালো লাগে তাই দেখে।

এ বাড়িতে দত্তগিন্নির সঙ্গেই তার প্রথম আলাপ। সেদিন গোলাপ গাছের গোড়ায় উই ঢিপি দেখে সে দত্তগিন্নিকে বলেছিল, গাছে উই লাগলে আর ফুল ফোটে না। দত্তগিন্নি খুশি হয়ে। তার বিনিময়ে নেপোকে একটা করে নাড়ুই তার পাওনা। ইতিমধ্যে দত্তবাড়ির বিল্টুর সঙ্গে খুব ভাব জমে উঠেছিল তার। বিল্টু প্রায় তারই সমবয়সী। একদিন বিল্টু তাকে পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে স্যার জগদীশচন্দ্র বোসের ছবি দেখিয়ে বলেছিল, 'ইনি গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছেন। সেই থেকে নেপো রোজ বিল্টুর ঘরে গিয়ে ছবিটাতে একটা প্রণাম করে আসে। এ যেন তার বাবাকেই প্রণাম করা। নেপো তার বাবাকে তো দেখেছে, কেমন করে সন্তান স্নেহে যত্ন করে গাছে গাছে জল দিতে আর ঘাড়ের উপর পাট করা গামছা দিয়ে গাছের পাতায় জমে থাকা ধুলো ময়লা মুছিয়ে দিতে। এ গাছই ছিল তার প্রাণ। আর সেই প্রাণ যিনি আবিষ্কার করেন তার কথায় এমনিতেই যেন নেপোর মাথা নুয়ে পড়ে।

এসবের কিছুই জানা ছিল না দত্তবাবুর। তাই খোকার

অনুপস্থিতিতে নেপোকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে সেদিন চোর সন্দেহই তাকে পাকড়েছেন। নেপো কিন্তু দত্তবাবুর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে না, মুখেও কিছু বলতে চায় না। তাই দত্তবাবুর রাগ ক্রমেই বেড়ে যায়, দু'চার থাপ্পর কষে দেয় তার পিঠে। তারপর ধাক্কা মেরে রাস্তায় বের করে দেয়। নেপোর চোখ ফেটে ফেটে শুধু দু-ফোটা প্রতিবাদের জল মুক্তোর মতো এসে ঝুলে থাকে। আর তারই আলোয় সে দত্তবাবুর টুকরো বাগানটা আর একবার দেখে নিয়ে দত্তবাড়ির সামনে থেকে সরে যায়।

বিল্টু এসবের কিছুই জানতে পারে না। সে তখন পাশের ঘরে তার নিজস্ব গবেষণায় ব্যস্ত ছিল। অবসরে তার ঐ এক খেলা। তার ধারণা গাছের যেমন প্রাণ আছে, তেমনি তাদের ভাষাও আছে, আছে তাদের একটা নিজস্ব জগৎ—যেখানে তারা মানুষের মতো চলাফেরা করে। সে জেনেছে মাংসাশী গাছের কথা—যা আফ্রিকার জঙ্গলে পাওয়া যায়। এদেশেও সূর্যশিশির, কলসপত্রীর অভাব নেই—যাদের পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ বলে।

এছাড়া দীঘায় ঝাউবনে অদ্ভুদ আওয়াজ সে শুনেছে, গাছেরই ভাষা। এমন ভাষা কোনো দিন শিখতে পারলে নিশ্চয় সে গাছের সুখ দুঃখের কথাও জেনে নিতে পারবে। বিল্টুর এই গবেষণার ভবিষ্যৎ নিয়ে যদিও বাড়ির আর কারো মাথা ব্যথা নেই। তবু নেপো তাকে তার অগোছালো ভাবনা দিয়ে কিছু উৎসাহ দিত। কিন্তু দত্তবাবু কাছে থাপ্পড় খাওয়ার পর নেপো আর এ বাড়িতে আসে না। এ নিয়ে কারো কিছু মনেও হয় না। আসলে তাকে প্রায় সকলেই ভুলে গেছে। প্রথম দিকে যদিও কয়েকদিন দত্তগিন্নি অন্যমনস্কভাবে তার খোঁজ পেতে চেয়েছিল, গোলাপ কিংবা বোগনভেলিয়া গাছটার পাশে, ভেবেছিল একটা নাড়ু দেবার কথা—সে ও বেশিদিন নয়। আর বিল্টু হয়তো তার অনুপস্থিতির অন্য কোনো অর্থ খুজে পেয়েছিল তাই এ নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। এর মাঝখানে ঘটল অন্য এক ঘটনা।

হঠাৎ সেদিন মাঝরাতে দত্তগিন্নি ঘুম থেকে উঠে দেখে, গোলাপ গাছটার পাশে নেপো ঠিক আগের মতোই এসে দাঁড়িয়েছে আর হাত পেতে বলছে—'মাগো, একটা নাড়ু দাও।'

দত্তগিন্নি দৃশ্যটা দেখে ভ্রায় হিম। ঘুম থেকে দত্ত-বাবুকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু কোথায় সে নেপো আর তার হাত পেতে নাড়ু চাওয়া। এ ঘটনারও কিছু জানলো না বিল্টু। দত্তবাবু ব্যাপারটাকে যদিও খুব পাত্তা দেয় না, তবু ভিতরে ভিতরে খোঁজ করতে থাকেন নেপোর। সেদিন তো জ্যোৎস্নার রাত ছিল না আর দূরের কোনো আলো এমন একটা দৃশ্য সৃষ্টি করতে পারে বলেও তার মতে হয় না। তাছাড়া দত্তগিন্নির কানে শোনা সেই নাড়ু চাওয়ার শব্দ—এ তবে কার ঃ ঐ হাড় জিরজিরে ছেলেটির ভয় দেখানোর দুঃসাহসও নিশ্চয় এ নয়। কিন্তু এর পরেও অবাক হবার কিছু ছিল। দত্তবাবু যখন জানতে পারলেন, সপ্তাহ খানেক আগে নেপো ক্তর বিকারে মারা গেছে। তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। অমঙ্গলের সম্ভাবনায় পুরুত ডেকে শ্রাদ্ধশান্তির ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এদিকে ঘটল আর এক বিপদ। সত্যয়নের কাজে ব্যস্ত, ঠিক তখনই নেপোর সঙ্গে বিল্টুর আশ্চর্যজনকভাবে দেখা হয়ে যায়। নেপো তাকে খবর দেয় অন্য এক গ্রহের, যেখানে গাছেরা মানুষের মতো কথা বলে। সেখানে পশু পাখিদেরও একটা বিশাল জগৎ আছে। এমন একটা দেশে যাবার উপায়ও সে বাৎলে দেয় বিল্টুকে।

মুন্সীপাড়ার পশ্চিমে যে সন্ন্যাসীতলা সেখানে এক অদ্ভুত জাতের মানুষ এসেছে—সেই গ্রহ থেকে। যদিও লোকটা কোনো উদ্ভিদ থেকে জাত কি না বোঝা যায় না। তবে তার শরীরটা অদ্ভুত রকমের। মানুষের মাথার মতো তার কোনো স্বাভাবিক মাথা নেই। মাথা আছে কোমরে। কোমর বন্ধের মতো কোমরের চারপাশে গজিয়ে উঠেছে মাথাগুলো, সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি চিবুক থেকে ঝুলে পড়া সবুজ ঘাসের মতো দাড়ি তার পোশাকের কাজ করছে। আর সেই সঙ্গে আর একটি কথা জানা গেছে, সে নাকি বজ্র-নাদে চলাফেরা করে। ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বের মাপে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ। কোনোটার নাম গামা ওয়ান, কোনোটা বা গামা টু—এই রকম সব বিচিত্র মাপের নাম সে শব্দের। এই শব্দ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বাহনও নেই সে দেশে। কিন্তু সে তো পরের কথা। এদিকে একমাত্র ছেলের শোকে দত্তগিন্নি বিছানায় অস্থির আর দত্তমশায় প্রায় পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছেন।

কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন আর থানা পুলিশে খোঁজের পর খোঁজ করেও কিছু হচ্ছে না। বিল্টু নিরুদ্দেশ হবার আগে সে তার বাবার নামে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখে রেখে

বিশ্বের বিস্ময়

কনস্টান্টিনোপলের পুরনো শহরগুলোয় আবর্জনা সরানোর কোন ব্যবস্থা ছিলো না। আবর্জনা জমা হতো রাস্তার ওপরে। তারপর মানুষ ও পশুর চলাচলের ফলে সেগুলো গোটা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তো। এইভাবে রাস্তাগুলো ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতো। তখন রাস্তার দুধারের বাসিন্দারা কাদা মাটি দিয়ে নিজেদের ঘরের মেঝেগুলো উঁচু করে নিতো। অর্থাৎ, রাস্তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের ঘরের মেঝের মেরামতি চলতো।

কুবলাই খানের পাঁচ হাজার মাইনে করা জ্যোতিষী ছিল। তারা নিয়মিত হাজিরা দিতো রাজসভায়। তাদের প্রধান কাজ ছিলো আবহাওয়ার পূর্বাভাষ রাজাকে জানানো। গননায় যাদের ভুল হতো তাদের দেওয়া হতো নানা রকমের কঠিন শাস্তি। সেই ভয়ে সব জ্যোতিষীই সর্বদা তটস্থ থাকতো। এ সব তথ্য আবিষ্কার করেন প্রখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো।

পানামা খাল কাটতে প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিলো। এমন একজন শ্রমিক ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী, তিনি হলেন ফরাসী চিত্রকর পল গগ্যাঁ। গগ্যাঁ নিজে বলেন, 'ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত মাটি কাটতে হতো আমাকে। মাথার ওপর গনগনে সূর্য, কখনো অঝোর বৃষ্টি নিয়ে কাজ করতে হত আর রাতে ছিলো সাংঘাতিক মশার কামড়।' ঐ খাল কাটার কাজে প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিক মারা গিয়েছিলো। আমাদের কপাল ভালো যে পল গগ্যাঁ তার মধ্যে ছিলেন না। তাহলে তার অমূল্য শিল্পকলা থেকে পৃথিবীবাসী বঞ্চিত হতো।

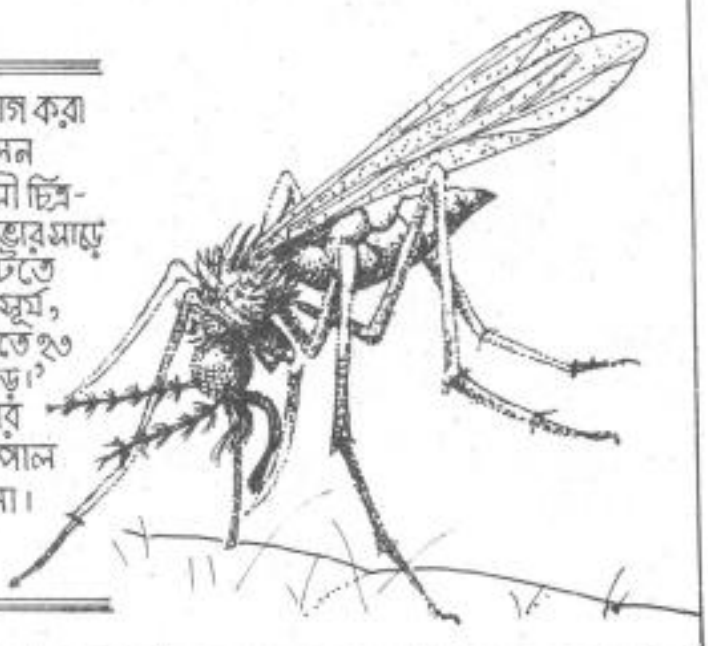

ভয়ংকর যাত্রী
মরার আগে শেষ দেখা দেখে নাও কিরিক! সন্ধ্যের মধ্যেই রিও পৌঁছে যাব! তারপর জেট প্লেনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমেরিকা। যেখানে তোমার হত্যা অপরাধের বিচার হবে!
তুমি আমাকে চামচিকে ভেবোনা কুপার!
রিও অবধি যেতে পারবে কি?
•• কিন্তু নরক ছাড়া কোথাও যাব না!
কি করছ? কিরিক! বুদ্ধু কোথাকার!

পিস্তল নামাও! কি করছ তুমি...
ব্ল্যাম!
গরুম গরুম গগরুম
বোকা কোথাকার...
ওঃ হ্ প্লেনটা যে গোত খেয়ে নিচের দিকে নামছে!
আ-হুহু!
এ যে কোন কাজ করছে না! হাতল আটকে গেছে! জঙ্গলের দিকে নেমে যাচ্ছে!
কিন্তু... তুমি...
নিচে নেমেই চলেছি! মাটি ছোঁয়ার আগেই ওপরে তুলতে হবে...
যন্ত্রপাতি সব বিকল হয়ে গেছে...
ক্র্যাশ

আবিষ্কার ও আবিষ্কারক

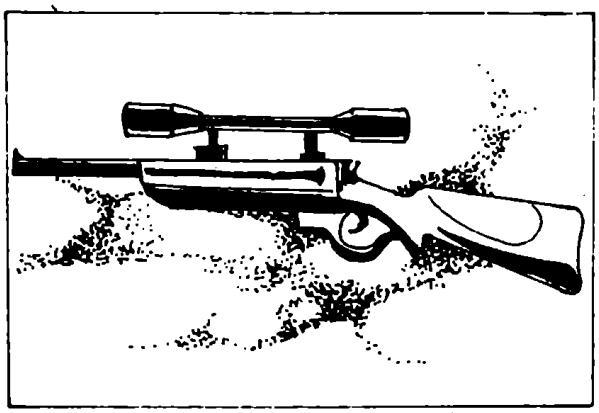

নলের ভেতরে প্যাঁচ কাটা রাইফেল আবিষ্কার করেন জার্মানির অগাস্ট কটার। – ১৫২০ সালে।

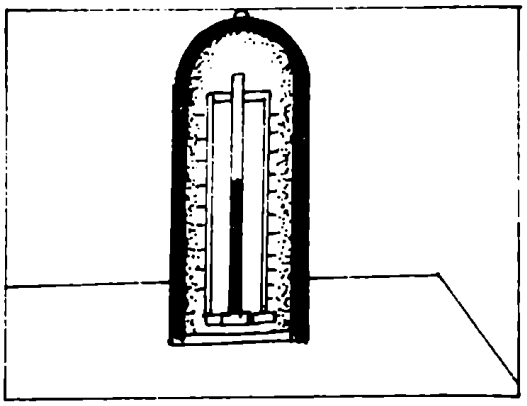

থার্মোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন ইটালির বৈজ্ঞানিক গ্যালিলেও গ্যালিলেই ১৫৯৩ সালে।

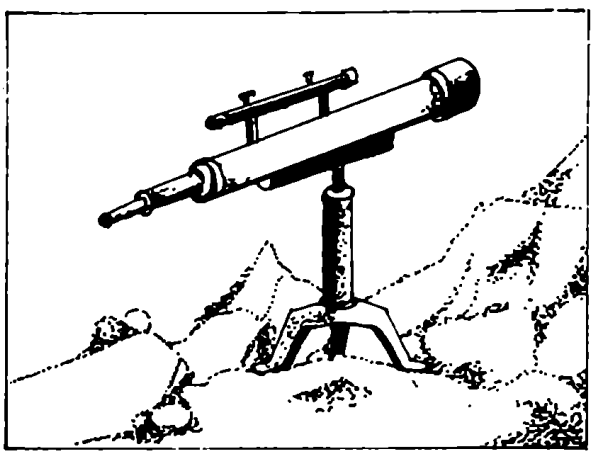

টেলিস্কোপ আবিষ্কার করেন নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানী হান্স লিপারশি, ১৬০৮ সালে।

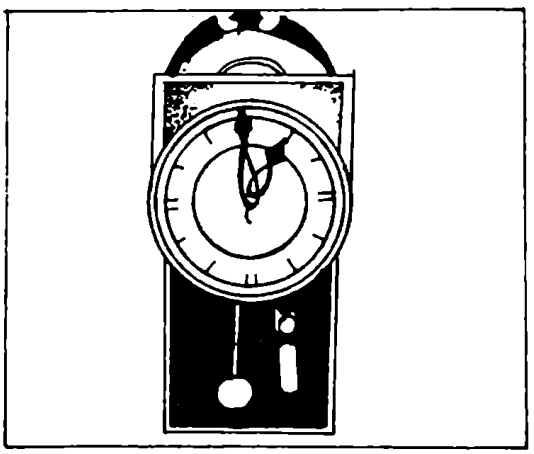

পেন্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কার করেছিলেন নেদারল্যান্ডের বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেনজ কোনসালে বলতে পারো কি? (উত্তর পরের সংখ্যায়।)

গেছে, তাই থেকে এই সব জানা গেছে মাত্র। কিন্তু এমন একটা অচেনা গ্রহের উপর খবরদারি করে তেমন জোর এই পৃথিবীর মানুষের কোথায় আছে। এদিকে কাগজের দপ্তরে হাফজান্তা কানেও পৌঁচেছে সে খবর। বিল্টু তার পাড়ার ছেলে, আর শুধু তাই নয়, বিল্টু তার মস্ত ফ্যান। অনেক সময় হাফজান্তার উদ্ভট প্রশ্নের যোগান দিত এই বিল্টু। তাছাড়া তার গবেষণার কথাও হাফজান্তার অজানা নয়। হাফজান্তার ধারণা ছিল এই বিল্টুই একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হবে।

এহেন একজন ফ্যানের নিরুদ্দেশে হাফজান্তা সত্যই ভীষণ বিচলিত। সে ভাবতে পারেনি এমন এক সমস্যার সমাধান কি করে সম্ভব। তার মনে পড়ে তন্ত্রবিদ নবীন ব্রহ্মের কথা, কিন্তু তিনিও আজ সাড়ে তিনমাসের জন্য মৌন আছেন। অবশেষে সবজান্তার দারস্থ হতে হয়।

সবজান্তা তাই সাত সকালে ভাবতে বসে গেছে এই নিয়ে। সবজান্তার ভাবনার কারণ যদিও অন্য। বিল্টুর এই ঘটনা থেকেই সে প্রথম জানতে পারলো পৃথিবীর বাইরেও প্রাণ আছে অন্য কোনো গ্রহে। আর শুধু প্রাণই নয়, সে এক বিস্ময়ের জগৎ। দেব বা দানব নয়, মানুষের বাইরে আর এক শক্তি।

সবজান্তা প্রথমেই তাই তার নিজস্ব সংগ্রহশালায় এসে হাজির হয়। সেখানে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা উল্কাপাতের অদ্ভুত রকমের সব পাথর। এই পাথর থেকেই নাকি ভিন্ন সব গ্রহের খোঁজ পাওয়া যাবে ফ্যাস্টম্ এফেকটের মাধ্যমে! সবজান্তা এর কিছুই বোঝে না, তাই ভিনদেশী মানুষের মতো সে একটা কোণে চুপ করে বসে থাকে। আর মাঝে মাঝে সবজান্তাকে বলে, ঘাটশীলা, দর্পশীলা— এসব জায়গা থেকেও তার কিছু পাথর সংগ্রহ করা আছে প্রয়োজনে সেগুলোও সে হাজির করতে পারে। সবজান্তা তার কোনো উত্তর করে না, সামনে রাখা একটা অদ্ভুত যন্ত্রের ভিতর শুধু একটা করে পাথরের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়ে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করে। তারপর আবার একটা পাথর এনে ঢোকায়। সবজান্তা জানে হাফজান্তার কথার কোনো যুক্তি নেই। কারণ ঘাটশীলা বা দর্পশীলা কোনো ভিন্ন গ্রহের নাম নয়। তার চেয়ে হাফজান্তা কড়ে আঙুলের মুনস্টোনটাকে বরং ভিন্ন গ্রহের বলা যায়! নিদেন পক্ষে জ্যোতিষরত্ন ক্যাটস আই, চুনি কিংবা পান্নাকে। এর মাঝখানে হাফজান্তা কোথা থেকে একটা নীলা জুটিয়েছে।

সংগ্রহে রাখবার মত
ছোটদের বই

ছোটদের
শেক্সপীয়র কাহিনী

একগুচ্ছ কালোত্তীর্ণ গল্প
ছোটদের পছন্দসই অনুবাদ
লু শুন-এর
ছোটদেরসেরা গল্প
১২

বিজ্ঞানী শতক
দেবব্রত রায়চৌধুরী

সুকুমার রায়
জানা অজানা ১০
ছড়ার যাদুকর সুকুমারের একগুচ্ছ বিজ্ঞানমনস্ক রচনা।

এ পি পি.
১৬৬ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সবজান্তার জানা ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রে নীলা ব্যবহার করে—শনির জন্যে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সবজান্তা মনোযোগ আনতে ব্যর্থ হয়। তাই তার মনে হয় সবজান্তার এই পাথরের ব্যাপারটা ফালতু। আসলে অন্য কোন মতলব তার মাথায় ঘুরছে। এমন সময় সবজান্তা অদ্ভুত যন্ত্রটির আইপিসে চোখ লাগিয়ে সত্যই একটা রহস্যের গন্ধ পায়। দেখতে পায়, একটা গোল বলকে ঘিরে রাখা একটা বলয়, আর সেই বলটি অনবরত পুবে পশ্চিমে পাক খেয়ে যাচ্ছে।

সবজান্তা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'চিনতে পারো এটা কোন গ্রহ।'

হাফজান্তা এই গোলের চারপাশে বলয়ের কথা ভেবে ততক্ষণ উত্তর দেয়, 'শনি, কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

সবজান্তা তখন তার স্বভাব গাম্ভীর্য টেনে বলে, 'এটা ফ্যান্টাম্ এফেকটের ফল। যার সাহায্যে কোনো খন্ড জিনিসকে সম্পূর্ণ দেখায়।'

এর মাঝখানে হাফজান্তার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন জাগে যদি খন্ড জিনিস থেকে তার সম্পূর্ণ অংশটা দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে কণিষ্কের মুন্ডহীন দেহটার সাহায্যে এই ফ্যান্টাম এফেকটে নিশ্চয় পুরো শরীরটাও দেখতে পাওয়া যাবে?

সবজান্তা এর কোন উত্তর না দিয়ে হাফজান্তাকে পর পর আরো কিছু টুকরো পাথরের সাহায্যে অন্য কয়েকটি গ্রহের দৃশ্য দেখায়।

এই ফ্যানটাম্ এফেকটের অন্য মজা পেলেও কিন্তু হাফজান্তা এতে বড় বেশি খুশি হতে পারে না। কারণ, আর কোনো গ্রহেই সে এ পর্যন্ত কোনো প্রাণীর চলাফেরা লক্ষ্য করেনি। এদিকে সবজান্তার সংগ্রহশালার সমস্ত পাথরই শেষ। সবজান্তাও ক্লান্ত প্রায়, তাই সেও খানিকটা নিরুৎসাহিত। তখন সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে রাত্রি। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে সবজান্তার। হাফজান্তা কিন্তু দমেও দমতে চায় না। বাড়ির শীল বা বাটনার পাথরটা অবধি সে একবার দেখে নিতে চায়, প্রয়োজনে শালগ্রাম শীলাটাও। এমন কোন গ্রহ যেখানে তারা লুকিয়ে আছে। সে গ্রহের কোনো পাথরই কি এখানে ছিটকে আসেনি। সবজান্তা কিন্তু এসব উদ্ভট ব্যাপারের মধ্যে আর যেতে চায় না। তাই সে হাফজান্তার হাতে যন্ত্রটি ছেড়ে দিয়ে সংগ্রহশালার এক কোণে ঘুমিয়ে পড়ে। আকাশে তখন থমথমে মেঘ আর সমানে বিদ্যুত ঝলক দিয়ে উঠছে। হাফজান্তার এ সবে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, সে আবার নতুন করে সমস্ত পাথরগুলোকেই খুঁটিয়ে দেখতে বসে গেছে, যদি দেখায় কোনো ভুল থেকে যায় এই সতর্কতায়। দেখছে শনি, দেখছে মঙ্গল, শুক্র—মাঝে বিরাট আয়তনের একটা ধূমকেতু। এমন সময় একটা বজ্রনাদ। মনে হয় কাছে কোথাও বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শহরের আলো গেল নিভে। হাফজান্তার ঘরও তখন অন্ধকার, তাই ফ্যানটাম এফেকটের যন্ত্র থেকে এবার তাকে চোখ সরিয়ে আনতে হয়।

কিন্তু একি: চোখ তুলে সে যা দেখলো, তাতে আর বিস্ময়ের কিছু বাকি রইলো না তার। এ যেন অন্য এক আলো। হাফজান্তা দেখতে পেল চোখের সামনে তিন মূর্তিকে। কোনোটাই তখন স্পষ্ট নয়। তারপর আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে উঠতে, তার শোনা সেই অন্য গ্রহের অদ্ভুত মানুষটির সঙ্গে একজনের মিল খুঁজে পেল। 'হিমকান্ত কাজাকিং ব্যোম খ্যাং—' এমনি সব অদ্ভুত উচ্চারণে অনবরত কথা বলে যাচ্ছিল সে।

অন্য গ্রহের মানুষই বটে। কিন্তু তার কথায় কি উত্তর দেবে এর কিছুই হাফজান্তার আয়ত্বে আসে না। একবার ইচ্ছে হয় তার সবজান্তাকে জাগিয়ে তুলতে, কিন্তু কি ভেবে আর জাগায় না। তাই এমনিভাবেই কেটে যায় কিছুক্ষণ, আর চোখের সামনে দেখতে পায়, অন্যগ্রহের মানুষটার পেছনের বাকি দুটি মূর্তিকে স্পষ্ট হয়ে উঠতে। তাদের মধ্যে বিল্টুকে আর চিনে নিতে অসুবিধা হয় না তার, আর অনুমানে চেনে নেপোকে। তখন বিল্টুর কাছ থেকেই হাফজান্তা অন্যগ্রহের অদ্ভুত মানুষটির পরিচয় জানতে পারে। আর জানতে পারে পৃথিবীর বাইরের এই 'চারশো বিশ' নম্বর গ্রহের কথা। পৃথিবীর বাইরে ন'টি গ্রহের কথা সে জানে। জানে তাদের নামগুলোও, কিন্তু তার মাঝখানে এমন একটা গ্রহ, যার নামের ইতিহাসটাই বা কি? এর উত্তর বিল্টুও জানে না। তার কাছ থেকে যেটুকু খবর পাওয়া যায়, তাই থেকে হাফজান্তা জানতে পারে—সে গ্রহে পৃথিবীর মানুষের মতো কোনো মানুষ বাস করে না। শুধু পশু পাখি আর গাছপালারই রাজত্ব সেখানে। সে গ্রহে গাছেরাই স্কুল চালায়, সভাসমিতি করে। আর মানুষ বলতে যা আছে, তারা সকলেই গবেষণাগারের বিশাল বিশাল সব জারের মধ্যে ফরম্যালডিহাইডে প্রিজার্ভ করা। কিছু জ্যান্ত মানুষ মাত্র চিড়িয়াখানায় দেখতে পাওয়া যায়, সেও আবার বিশেষ দিনের প্রদর্শনী ছাড়া দেখা যায় না। কারণ এই মানুষদের নিয়েই এখন তাদের গবেষণা।

এমনি এক গবেষণার কারণে 'চারশো বিশ' নম্বর গ্রহ থেকে সেবার বোমশংকর নামে একটি রোবটকে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীতে, মানুষের স্পেশিমেন সংগ্রহ করতে। কিন্তু সে মানুষের হাটে বিক্রি হয়ে এখন ঘোর সংসারী হয়ে গেছে। তাই তারা এবার পাঠিয়েছে 'চিং-বং' নামের এই অদ্ভুত জাতের মানুষটিকে। এই 'চিং-বং' ও তাদের একটি গবেষণার ফল। কিন্তু সে-ও প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। পৃথিবীতে এতো মায়া!

এই 'চিং বং' এর প্রথম নজর পড়ে প্রকৃতি প্রেমী নেপোর উপর। কিন্তু তার শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিনের অভাব থাকায়, তাকে দিয়ে কোনো উন্নত মানের গবেষণায় ফল পাওয়া যাবে না। তাই তাদের দ্বিতীয় নজরটি পড়েছিল বিল্টুর ওপর। কিন্তু বিল্টুকে দিয়েও তেমন কিছু হবে না বলেই তাদের গবেষক মহলের ধারণা। কারণ বিল্টুর শরীরে এমন কিছু লক্ষণ পাওয়া গেছে, যাতে তার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে ভবিষ্যতে গাছ হয়ে যাওয়ার; তারা চায় খাঁটি মানুষ। ইদানিং বিল্টুর নাকি মুখ দিয়ে খাওয়ার ব্যাপারটাও প্রায় কমে যাচ্ছিল। আলো বাতাসেই দিন চলে যায়—এমনই ধারণা তার মা-বাবার। বিল্টুর সমস্ত খাবারেই এখন অরুচি। তা'ছাড়া বদ-হজম আর অম্বল তো লেগেই আছে। সে আবার কিছু দিন ধরে পা দিয়ে গাছের মতো মাটির রস শুষে নেওয়ার কৌশলও আয়ত্ব করছে নাকি, এর প্রথম ফল পাওয়া যায়,—বাগানে খালি পায়ে জল দেবার পরের দিনই তার জলো সর্দি। পা দিয়ে জল টেনে নেওয়ারই নাকি এই ফল। তাই নেপো আর বিল্টু দু'জনকেই তারা 'চারশো বিশ' নম্বর গ্রহ থেকে ফেরৎ পাঠিয়েছে। তৃতীয় নজরটা হাফজান্তা উপর। হাফজান্তা অদ্ভুত মস্তিষ্কের খোঁজ পেয়েছে তারা বিল্টুর কাছে। সে-ই নাকি পৃথিবীতে এক মাত্র খাঁটি মানুষ। সবজান্তা কিন্তু এর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই সে বিল্টুর কথায় ভয় পেয়ে বিকট এক চিৎকার করে ওঠে। যা বজ্রনাদের চেয়েও তীব্র। সে শব্দে সবজান্তাও ঘুম থেকে জেগে ওঠে আর নিরুদ্দিষ্ট হয় গ্রহের মানুষটি। পড়ে থাকে শুধু বিল্টু আর নেপো। এই অদ্ভুত মানুষটির পালিয়ে যাওয়ার কারণ তার বজ্রনাদের বাহন। সবজান্তার চিৎকারে সেই বাহনকে পেয়ে সে উধাও হয়ে যায়। আর যাবার সময় ধাক্কা মেরে ভেঙে দিয়ে যায় সেই ফ্যানটাম এফেক্টের যন্ত্রটা। যা দিয়ে তারা আর কোন দিনও 'চারশো বিশ' নম্বর গ্রহের সন্ধান করার সুযোগ পাবে না।

সবজান্তা কিন্তু এ সবের কিছুই বুঝতে পারে না। শুধু জেগে উঠে দেখে তার ফ্যানটাম এফেক্টের যন্ত্রটি কিসের একটা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। আর তাকে ঘিরে অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি মূর্তি। সবজান্তার মুখে তখন যেন কিসের একটা ভয়। বিল্টু এসবের কোনো সাক্ষী নয়, এমনই নীরব। আর নেপো তারই মাঝখানে একটা দম ছেড়ে শুধু একবার বলে ওঠে 'মাগো, একটা নারু দাও।'

হাফজান্তা সারা মুখে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে ভাবতে থাকে—এ ঘটনা যদি সত্যি হয়, তবে নেপোর মৃত্যুর ঘটনাটা কি? আর নেপোর মৃত্যুর ঘটনা সত্যি হলে পুরো ব্যাপারটাই কি একটা ভৌতিক স্বপ্ন?

মানুষের দেহ এক ভাণ্ডার

মানুষের দেহে কতটা ফসফরাস থাকে জানো? যতোটা ফসফরাস পাওয়া যায় তা দিয়ে ২২০টি দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী করা যায়। এবং ৬টা সাবান কেক তৈরী করা যায় প্রাপ্ত চর্বি থেকে। ২৮ পাউন্ড কোকে যে কার্বন পাওয়া যায় তা আমাদের দেহেই মজুত রয়েছে। যে পরিমাণ লোহা থাকে তা দিয়ে একটি এক ইঞ্চি পেরেক তৈরী হতে পারে।

হিপোক্রেটিস

বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান

দেবব্রত রায়চৌধুরী

আমার ছোট ছোট ভাই-বোনেরা, তোমাদের অনেকেরই হয়তো ইচ্ছে আছে যে, বড় হয়ে ডাক্তার হবে ; অর্থাৎ চিকিৎসা-শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করবে। তোমাদের মধ্যে বড় হয়ে যারা সঠিক কৃতিত্ব ও মেধার পরিচয় রাখতে পারবে, তারা অনায়াসেই তাদের ইচ্ছেটাকেও পূর্ণ করতে পারবে।

কিন্তু প্রাচীনকালে গ্রীসদেশে ব্যাপারটা ছিল একটু অন্যরকম। সেখানে তখন শুধুমাত্র এক শ্রেণীর লোকই এই ডাক্তারী-শাস্ত্র পড়তে বা চর্চা করতে পারত। এদেরকে বলা হোত অ্যাসক্লেপিয়াড।

অ্যাসক্লেপিয়াড কথাটা এসেছে অ্যাসক্লেপিয়াসের থেকে। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর পুত্র, অ্যাসক্লেপিয়াস ছিলেন একজন যশস্বী চিকিৎসাবিদ। তাঁর নামে বহু

মন্দির সেকালে গ্রীসে ছিল। এই সমস্ত মন্দিরের পুরোহিতদের বলা হোত অ্যাসক্লেপিয়াড।

পরবর্তীকালে এই অ্যাসক্লেপিয়াডদেরই এক বংশধর, মহান মণীষি হিপোক্রেটিস, চিকিৎসা-শাস্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করেন এবং সর্বসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেন।

তাই হিপোক্রেটিসকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের জনক বলে অভিহিত করা হয়।

এখন নিশ্চয়ই ওঁর সম্বন্ধে জানতে তোমাদের মন খুব উসখুশ করছে। তাহলে বলি, শোনো ঃ—

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০ সালে, অ্যাগিয়ন সাগরের কসদ্বীপে, এক পরিবারে হিপোক্রেটিসের জন্ম। তাঁর বাবা কসেরই এক জমকালো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী, হিপোক্রেটিস তাঁর বাবার কাছ থেকে চিকিৎসা-বিদ্যা লাভ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে মধ্য বয়সে, তিনি তখনকার সমস্ত সভ্যতা কেন্দ্রগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখেন। একসময়ে এথেন্সে তিনি বহুবছর কাটান। সেখানে তিনি নিজ চিকিৎসা-শাস্ত্র চর্চা করতেন এবং অপরকে তা শেখাতেন। এখানেই দার্শনিক প্লেটোর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। প্লেটো তাঁর জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে তাকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক মহান উপাসক বলে অভিহিত করেন।

অবশ্য তার যথেষ্ট কারণও আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সেই শৈশবে হিপোক্রেটিসের আবির্ভাব হলেও, তাঁর কিছু কিছু মতবাদ ছিল আশ্চর্য্য রকমের আধুনিক। যেমন, তাঁর হিউমোরাল মতবাদ, তাঁর মতে এই হিউমোরের (জীবদেহ নিঃসৃত ঘুম) বড়সড় পরিবর্তনের ফলেই মানুষের আচার-ব্যবহার অস্বভাবিক হয়ে ওঠে, এমনকি কখনও কখনও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

হিপোক্রেটিসের মতে, সমস্ত শাস্ত্রের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রই সবচেয়ে মহান। কিন্তু কিছু কিছু অজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্যে এটা সমস্ত বিদ্যার পেছনে রয়েছে। সেইজন্য তাঁর ছাত্রদের তাঁর কাছে একটা গোপন অঙ্গীকার করতে হোত। পরে এই শপথ 'হিপোক্রেটিয় শপথ' নামে পরিচিত হয়। আজও এটা প্রচলিত, আজও প্রত্যেক ছাত্রকে ডাক্তারী পাশ করার পর এই বলে শপথ করতে হয় যে, সে, তার জীবন এবং তার পেশাকে (ডাক্তারী) পবিত্র ,নির্মল ও সুন্দর করে রাখবে। পরিশেষে বলে রাখি, খ্রীষ্টপূর্ব ৩৭০ সালে, এই মহা মণীষির মহাপ্রয়াণ ঘটে।

অজয় ঘোষ

ধাঁধা

অসীমবাবুর জোড়া ধাঁধা

অসীমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ইডেন গার্ডেনে বছর দু-তিন আগে। নামী দামী খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী বিশ্ব একাদশ সেবার প্রথম খেলছে কলকাতায়।

ঠাণ্ডা জানুয়ারীর সকালে মাঠে ঢুকে পুরোনো খবরের কাগজটা গ্যালারীতে বিছিয়ে বেশ যুত করে বসেছি, স্কোর বোর্ডে কারা কারা খেলবে সেই নামগুলো সবে লাগাতে শুরু করেছে, সবকটা লাল আলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে বিশাল বপু এক ভদ্রলোক এসে হাজির। এদিক ওদিক সিট নম্বর খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পেয়েছি বলে আমার পাশে বসলেন। ঘাম-টাম মুছে আমার দশ ইঞ্চি বরাদ্দ জায়গার সাত ইঞ্চি দখল করে প্রশ্ন করলেন—আজকের টিম কি?

আমার বেশ একটু রাগ হয়ে গেল, বললাম, 'স্কোর বোর্ডে তো দিয়ে দিচ্ছে, দেখে নিন।'

সামনের সিটের মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক আমার বিরক্ত গলা শুনে পেছন ফিরে আমার অবস্থা দেখে বেশ মুচকি হাসলেন। ভাবখানা এমন যেন আমি আজই প্রথম মাঠে এসেছি। আমার মেজাজটা গেল আরও খারাপ হয়ে। কিন্তু উপায় নেই। এদের মধ্যেই আমায় আরও চারদিন কাটাতে হবে। যাক্‌গে, খেলাটা ভাল হলেই হল। হঠাৎ পাশ থেকে প্রশ্ন, 'খোকা, এদের মধ্যে উইকেট কীপার কোনজন?'

ভীষণ রেগে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সামনের ভদ্রলোক পেছন ফিরে বললেন, 'সেটা অবশ্য কোন কাগজেই পরিস্কার লেখেনি। আসলে আজ কে খেলবে, সে ওদের সেকেণ্ড উইকেট কীপার। তবে কিছু কিছু কাগজ আছে, যারা খেলা ছাড়া আর সব খুব ভাল লেখে। যেমন, কে কোথায় কাল ছিল—কার বাড়ীর পাশে একটা আমলকী গাছ আছে, গতবার হেরে যাওয়ার পর কে কার নামে কি বলেছিল। লোকে বলে, রিপোর্টারগুলোর কোনো কাজ নেই। আমি কিন্তু আবিষ্কার করেছি সব খবর একটা জায়গায় করলে তার থেকে টিম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।'

'কি কি জানা যায়?'—পাশের ভদ্রলোকের প্রশ্ন। 'সমস্ত ব্যাপারগুলোকে আমি অবশ্য ছোটো করে ছটা পয়েন্ট করেছি।'

এক—সিম্পসন জ্যাকসন আর রিচার্ডসন এই তিনজনের একজন উইকেট কীপার, একজন স্পিনার আর একজন ওপেনার। কে যে কোনটা সেটা অবশ্য কাগজে ঠিক লেখেনি। এ-ছাড়া লার্টার, কার্টার আর স্পিনটার এই তিনজন অলরাউণ্ডার, এই ছ-জন তিনটে দেশের। প্রত্যেক দেশের দুজন করে আছে।

দুই—স্পিনটার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্লেয়ার।

তিন—স্পিনার যিনি তিনি আঠারো বছর বয়স থেকেই মেলবোর্ণ শহরের সবচেয়ে লম্বা লোক।

চার—কার্টার খুব ভাল ডানহাতি ব্যাটসম্যান। তা ছাড়া ভাল বলও করেন। গত অ্যাসেজ

'অ্যাসেজ' ব্যাপারটার উৎপত্তি ১৮৮২ সালের আগস্ট মাসে। সে-বছর ২৮শে আগস্ট ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট টেস্ট শুরু হয় ওভালে। ইংল্যাণ্ড সেই টেস্টে মাত্র সাত রাণে পরাজিত হয়। তখন ইংল্যাণ্ডের 'স্পোর্টিং টাইমস' নামে একটি পত্রিকায় ইংলিশ ক্রিকেটের 'মৃত্যু সংবাদ' ঘোষণা করা হয়। তাতে শোক প্রকাশ করে বলা হয়, 'মরদেহ 'দাহ' করে চিতাভস্ম নিয়ে যাওয়া হবে অস্ট্রেলিয়ায়। সেই থেকেই 'ভস্ম' বা 'অ্যাসেজ'-এর উৎপত্তি।

সিরিজে উনি সাতবার জ্যাকসনের উইকেটটা নিয়েছিলেন।

পাঁচ—বা হাতি অলরাউণ্ডার খেলোয়াড়টি স্পিনারএর সঙ্গে নাইনথ্ উইকেট পার্টনারসীপে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছেন। ছয়—ওপনার আর সিম্পসন কাল কে, সি দাশের দোকান থেকে বেশ কয়েকটা রসগোল্লার টিন কিনেছেন। এগুলো থেকে সহজেই বুঝতে পারছেন, উইকেট কীপার কে?'

পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওনার মুখটাও প্রায় রসগোল্লা হয়ে গেছে। লাঞ্চ অবধি ভদ্রলোক কোনো কথা বলেননি। আর লাঞ্চের পর থেকে আমিই দুটো সিট নিয়ে বসে-ছিলাম। আমার কিন্তু ব্যাপারটা বেশ মজার লেগেছিল। উইকেট কীপারের নামটা সত্যি আমি জানতাম না। কিন্তু ওনার দেওয়া সূত্র থেকে বের করে ফেলেছিলাম, আসল নামটা। তারপর থেকেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করছিল।

খেলার শেষে বললাম, 'আপনার ধাঁধাটা কিন্তু আমার বেশ লেগেছে।'

'করতে পারলে?'

'হ্যাঁ, হেনরী ডুডিনির একটা বইয়ে এই রকম কয়েকটা ধাঁধা আমি আগে দেখেছি। তবে এত তাড়াতাড়ি সাজালেন আমার বেশ ভাল লাগল। 'বাঃ, হেনরী ডুডিনির সমঝদার পাঠক তুমি। তাহলে আমার বন্ধু নিশ্চয়ই।' বলে হাত বাড়িয়ে বললেন। 'ইনফাইনাইট ফ্রেণ্ড।'

'আমি হাতটা ঝাঁকিয়ে নিজের নাম বলে বললাম।

'অসীম মিত্র না অনন্ত মিত্র?'

হোহো করে হেসে বললেন; 'প্রথমটা।

'তাহলে আর একটা ধাঁধা দিন, বাড়ী গিয়ে করব।'

'আরেকটা ধাঁধা' বলে এক মিনিট ভেবে বললেন, 'শোনো, চারটে সবুজ লুডোর ঘুঁটি আছে।

অরুণ, বরুণ আর তরুণ-এর চোখ বেঁধে ওদের কপালে দুটো-দুটো করে ঘুঁটি লাগিয়ে দেওয়া হল, এবার তিনজনকে সামনা সামনি বসিয়ে, অরুণ, আর তরুণকে পরপর জিজ্ঞেস করা হল, তোমাদের কপালে কি ঘুঁটি লাগানো আছো জানো কি? সবাই বলল, না। এরপর অরুণকে আবার জিজ্ঞেস করা হল। অরুণ না বলতে পারায় বরুণকে প্রশ্ন করা হল। বরুণ কিন্তু এবার 'হ্যাঁ' বলল। ওর কপালে কি ঘুঁটি ছিল?'

মাঠ প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। আমরাও আস্তে আস্তে বেরোতে লাগলাম।

হেনরী আর্নেস্ট ডুডিনিকে বলা যায় ধাঁধার রাজা। ধাঁধা নিয়ে চর্চা করেছেন, গবেষণা করেছেন, আর বইতো লিখেছেনই। ব্রিটিশ এই ধাঁধার জাদুকর ১৯৩০ সালে তিরাশি বছর বয়সে মারা যান!

'কাল আবার আসছেন তো?'

'না ভাই, একদিনের টিকিট কোনো মতে জোগাড় করেছিলাম। তা ছাড়া অফিস আছে।' আমার বাড়ীতে, গল্প করা যাবে।' বলে পকেট থেকে ট্রামের টিকিট বের করে উল্টোদিকে ঠিকানাটা লিখে দিলেন। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

পরে অবশ্য ধাঁধা পাগল অসীমবাবুর সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছে। সে সব পরে বলব। খালি একটা কথা, খেলার মাঠের পাশের ভদ্রলোক মাঠে আর চারদিন আসেন নি—জানি না কেন?'

তার জায়গায় আমার মত একজন ছেলে এসেছিল। সে অবশ্য ধাঁধাটা পারে নি। তবে অনেকক্ষণ ভেবেছিল। তোমরা অনেকেই নিশ্চয়ই পারবে। চেষ্টা করেই দ্যাখো না।

থেকে বেরিয়ে বলেন স্বয়ং ডঃ আর পি গুপ্টা। হাতে একটা প্রকাণ্ড সুটকেস। পোশাকে ধুলো ময়লা আর চাপচাপ রক্ত লেগে আছে। বারান্দা থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলে গেলেন।

কর্ণেল বললেন, 'যাক্ গে। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে।'

বললুম, 'রহস্যটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যই থেকে গেল, কর্ণেল!'

কর্ণেল একটু হাসলেন। 'তা ঠিক। তবে যা আশঙ্কা করেছিলুম, সম্ভবত তত কিছু ঘটবে না। কারণ ফ্র্যাংকেনষ্টাইনের সেই দানব শেষ পর্যন্ত দানবই থেকে গিয়েছিলো। কিন্তু ডঃ গুপ্টাকে দেখলুম, দিব্যি ভদ্রলোকের মতো নিজের জিনিসপত্র নিতে এসেছিলেন। তার মানে, সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে ওঁর এবং ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই সাব্যস্ত করেছেন।...

পরদিন আমরা জঙ্গল থেকে সেহরাগড় টাউনশিপে ফিরে গেলুম। তারপর সেখান থেকে বাসে চেপে ফৈজাবাদ! কলকাতা ফেরার ট্রেন রাত বারোটা নাগাদ! একটা হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে কর্ণেল হঠাৎ বললেন, 'চলো জয়ন্ত, ডঃ গুপ্টার খোঁজখবর নিয়ে আসি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'সর্বনাশ! উনি কি ফৈজাবাদের লোক নাকি?'

'বাংলোর খাতায় সেই ঠিকানাই তো জেনেছি।'

'কিন্তু...'

কর্ণেল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার ধারণা, ডঃ গুপ্টা এখন আর নরদানব বা ঘটোৎকচ হয়ে নেই। কাজেই ওঁকে ভয় পাবারও কিছু নেই। হয়তো ভুলটা আমারই। আমি ওঁকে সচেতন করে দেওয়াতে ওইসব বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। তোমাকে সেই পাগলের গল্পটা বলেছিলুম, আশাকরি মনে আছে। কোনো কারণে মানুষের মধ্যে অস্বাভাবিকতা এলে তাকে উত্যক্ত করা উচিত নয়।'

রাত তখন প্রায় নটা। কিন্তু ফৈজাবাদ ছোট্ট শহর! ডঃ গুপ্টাকে সবাই চেনে—সেটা উনি লম্বা মানুষ বলেই! শেষদিকে একটা টিলার গায়ে একটা পুরনো গড়নের বাড়ি। টাঙ্গাওয়ালা গেটের কাছে নামিয়ে দিল আমাদের। লন পেরিয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল, বাড়িতে যেন জনমানুষ নেই। অস্বাভাবিক স্তব্ধ পরিবেশ। তবে আলো দেখা যাচ্ছিল একটা ঘরে।

দরজার বোতাম টেপার বেশ কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলল। সেই অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা মানুষ, চেনা মুখ। অমায়িক হেসে বললেম, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

আমি তো অবাক। কর্ণেল নমস্কার করে বললেন, 'আপাতত আসছি সেহরাগড় থেকে। আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে, ডঃ গুপ্টা।'

ডঃ গুপ্টা ভুরু কুঁচকে কী স্মরণ করার চেষ্টা করে বললেন, 'সেহরাগড়? সেখানে তো একটা জঙ্গল আছে শুনেছি। যাক্ গে, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে ঢুকে আমরা বসলুম। ডঃ গুপ্টাও বসলেন। ওঁর মুখে বিস্ময় লক্ষ্য করছিলুম। কর্ণেল বললেন, 'ডঃ গুপ্টা, আপনার প্রজেক্ট যে সাকসেসফুল সেই কথাটা বলতে এসেছি—যদিও দেশের আইনে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন!'

ডঃ গুপ্টা চমকে উঠলেন। 'কী বলছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনার ফ্যাক্টম প্রতিমূর্তি সেহরাগড় জঙ্গলে বীভৎস কাণ্ডকারখানা করেছে, জানেন কি?'

ডঃ গুপ্টা নড়ে বসলেন। 'মাই গুডনেস।'

'হ্যাঁ। এক ডজন হরিণ, একটা বাঘ আর একজন ফরেষ্ট গার্ডকে আপনার ফ্যাক্টম প্রতিমূর্তি খুন করে ফেলেছে। অসংখ্য গাছ উপড়ে ফেলেছে! সেহরাগড় কেল্লাটা ভাঙচুর করেছে। এমন কী, একটা দাঁতাল হাতিকেও মারাত্মক জখম করেছে।'

ডঃ গুপ্টা দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙাগলায় বললেন, 'কিন্তু আমার তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু আপনি একজন বায়ো-ফিজিশিষ্ট্। আপনি জানতেন, আপনার ফ্যাক্টমপ্রজেক্টের পরিণতি সাংঘাতিক হতে পারে।'

ডঃ গুপ্টা উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, মাসতিনেক আগে হঠাৎ আমার উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পর কী কী ঘটেছে, এখন একটুও মনে নেই।'

'আইন কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে না ডঃ গুপ্টা।'

ডঃ গুপ্টা হঠাৎ সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর ঝনঝন দুমদাম প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেল। উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার কর্ণেল?'

□-□□-শব্দছক□□□□□

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

সূত্র : পাশাপাশি

১। উড়িয়ে ঘুড়ি বেঞ্জামিন
ধরেন কি যে শির জামিন।

২। লোহা বন্দী
কি যে আজব ফন্দী।

৫। গ্রহদের বাইরে আছে
যাহা তাইরে।

৬। মানুষের প্রিয় ধাতু
প্লেগ লেগে হয় ছাতু।

৭। পুরাণো সেই দিনের কথা
মানুষ গুহ য় থাকতো যথা।

৮। মেরুদেশের মৎস্য
নামটি কহ বৎস।

৯। দুটো গ্যাস, হলো কি যে
মিঃ লো যেই গেলাম ভিজে

১১। এমন পাখি রোজ তো দেখি
লাতিন নামে ডাকছো একি!

১২। মিশেল যদি চাই ভালো
আরও খানিক জল ঢালো।

সূত্র : উপর-নিচে

১। পাখির মত উড়তে চাই
কল বানালেন রাইট ভাই।

৩। '—', তরল, বায়বীয়
শূণ্য পূরণ করে নিও।

৪। বিজ্ঞানী অনন্তা
পোল্যাণ্ডের কন্যা।

৬। উল্টে পাল্টে যাচ্ছে তাই
এমন অঙ্ক চাইনা ভাই।

৮। ছাপার হরফ চাই বুঝি?
এই ধাতুকেই তাই খুঁজি।

১০। ধাতুর গায়ে অ্যাসিড ঢেলে
এমন জিনিস সদাই মেলে।

[ঘটোৎকচের জাগরণ]

'কর্ণেল হাসলেন, 'ল্যাবরেটরি ভাঙছেন! প্রমাণ লোপের চেষ্টা। যাইহোক, আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়, জয়ন্ত। চলো, আমরা কেটে পড়ি।'

ষ্টেশনে পৌঁছে বললুম, 'ফ্যান্টম প্রতিমূর্তি ব্যাপারটা কী, খুলে বলুন তো?'

কর্ণেল বললেন, 'প্রতিবস্তুর কথা নিশ্চয় শুনেছ মানুষের ব্যক্তিসত্তার তেমনি কোনো প্রতিরূপ আছে কি না, এনিয়ে বায়োফিজিস্ট গবেষণা করেছেন। কতকটা ডঃ জেকিল এবং মিঃ হাইডের ব্যাপারটা যেমন। তবে ওই প্রতিরূপ ফ্যান্টম অস্তিত্ব কোনো মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রের একেবারে উল্টো না হতেও পারে। আমাদের মধ্যে একটা করে প্রতি-মানুষ আছে। সে অসম্ভব শক্তিমান। তাকে দিয়ে যেমন ভাল কাজ করানো যায়, তেমনি খারাপ কাজও করানো যায়। কাজেই ওই ফ্যান্টম-প্রতিমূর্তিকে তুমি ঘটোৎকচ বলতেও পারো। ভুলে যেও না, মহাভারতের ঘটোৎকচ একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। তবে অতিমানুষ। তাকে জাগালে ভাল বা মন্দ, দুই ঘটতে পারে।'

ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছিল না! তাই বললুম, নিকুচি করেছে ফ্যান্টম ব্যাটার। তাকে জাগিয়ে কাজ নেই।'...

বিজ্ঞানের ভেলকি

ম্যাজিক জানালা

এই মজার ম্যাজিকটি দেখিয়ে তুমি মহূর্তে বাহবা পেতে পারো। ম্যাজিকটি খুবই সহজ ও অদ্ভুত। কাউকে তুমি এমন তিনটি সংখ্যা লিখতে বলো যার প্রথম ও শেষ সংখ্যাটির মধ্যে পার্থক্য অন্তত যেন ২ হয়। ধরো সে লিখিল ৫৪৮। এবার তাকে এই সংখ্যাটি উল্টে লিখতে বলো (৮৪৫)। তারপর দু'টি সংখ্যার বিয়োগ ফল বার করতে বলবে—অর্থাৎ, ৮৪৫—৫৪৮ =২৯৭। এবারে বিয়োগফলকে উল্টে লিখতে বলে সংখ্যা দু'টি যোগ করতে বলো। দেখবে যোগফল হবে, ৭৯২ + ২৯৭ =১০৮৯।

এবার তোমার বন্ধুকে একটা জানালা দেখিয়ে বলো, এই জানালার শার্সির উপর 'ফু' দাও' (যাতে মুখের ধোঁয়া গিয়ে পড়ে শার্সিতে)। 'এবার দেখো অঙ্কের উত্তরটা ম্যাজিকের মত শার্সিতে ফুটে উঠেছে।' বন্ধুর মুখের নিশ্বাস কাঁচের উপর পড়তেই সে দেখতে পাবে ম্যাজিকের মত ১০৮৯ সংখ্যাটি কাঁচে ফুটে উঠেছে।

এই ম্যাজিকের গোপন ব্যাপারটা খুবই সোজা: উত্তরটা সব সময়েই হবে ১০৮৯। ম্যাজিকটা দেখাবার আগে, জলে একটু ডিটারজেন্ট গুলে নাও। তারপর আঙ্গুলের ডগা ঐ জলে ডুবিয়ে শার্সির উপর লিখে রাখো ১০৮৯। শুকিয়ে গেলে লেখাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু যে কেউ ঐ শার্সির উপর নিশ্বাস ফেললে ঐ সংখ্যাটি ছাড়া সব জায়গা ধোঁয়াশা হয়ে যাবে—ফলে ১০৮৯ সংখ্যাটি ফুটে উঠবে। খেলাটি শীতকালে দেখালেই ভালো ফল পাবে।

Kishore Vismoi May'84 Rs. 2·50 De. No.37/84

ছোটদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি আশ্চর্য পত্রিকা

কিশোর বিস্ময়

দু মলাটের ভেতর এক আশ্চর্য জগৎ

আগামী সংখ্যায়

পৃথিবীতে বড় প্রানীদের সংখ্যা ছোট প্রানীদের চেয়ে অনেক কম। মেয়ে হাতি একবারে একটি শিশু হাতির জন্ম দেয়, তাও ৩০ বছর বয়সের আগে নয়। অন্যদিকে একটি প্রজাপতি ৩০০ টি ডিম পাড়তে পারে।

এই রকমই সব জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর, কমিকস ধাঁধা, বিজ্ঞানের গল্পকল্প, আবিষ্কারের কাহিনী তাছাড়া **জলে** নিয়ে বিশেষ ক্রোড়পত্র

গল্প

আনন্দ বাগচী : ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

নিরঞ্জন সিংহ

উপন্যাস

ত্রয়োদশ বর্ষন